

হরর কাহিনি

ওখানে কে?

অনীশ দাস অপু

তাঁরা জেনে আনন্দিত হবেন এখন থেকে আমি আবার নিয়মিত হব লেখালেখিতে। যাঁরা ভয় পেতে ভালবাসেন, তাঁদের গ্যারান্টি দিচ্ছি, রাতের ঘুম হারাম করার মত দুর্দান্ত সব হরর ও পিশাচ কাহিনি নিয়ে শীঘ্রি আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছি। সবাই ভাল থাকুন।

অনীশ দাস অপু
মুঠোফোন: ০১৭১২৬২৪৩৩৬

ওখানে কে?

প্রচণ্ড গরম পড়ছে ক'দিন ধরে। ইলিনয়ের এই ছোট্ট শহরটার অধিবাসীরা প্রতিদিনই সেদ্ধ হচ্ছে বিশ্রী গরমে। সূর্য তীব্র উত্তাপে মানুষ এবং প্রকৃতি দগ্ধ করে রোজকার মত আজও বেশ কিছুক্ষণ আগে বিদায় নিয়েছে পশ্চিমাকাশে, পাহাড়ের আড়ালে। সূর্য অস্ত যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই হেসে উঠেছে চাঁদ। কিন্তু এই সন্ধ্যায়, অন্যান্য দিনের মতই দ্রুত খালি হতে শুরু করেছে রাস্তাঘাট। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সবার মধ্যেই ঘরে ফেরার অস্বাভাবিক একটা তাড়া। সন্ত্রস্ত ভাব চোখে-মুখে।

সবাই যখন ঘরে ফিরছে, সুন্দরী, তন্বী ল্যাভিনিয়া তখন নিজের বাড়ির বারান্দায় বসে ঠাণ্ডা লেমোনেডের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। ভঙ্গিটা অন্যমনস্ক; যেন কারও জন্য অপেক্ষা করছে। তার ছোট্ট ফর্সা কপালে মুক্তোর মত ঘাম। কী যেন ভাবনায় বিভোর সাগরের মত নীল দুই চোখ।

'হাই, ল্যাভিনিয়া।'

মিষ্টি কণ্ঠটা কানে যেতেই চমক ভাঙল ল্যাভিনিয়ার, ঘুরল। ফ্রান্সিন, ওর বান্ধবী, বারান্দার শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। সাদা পোশাকে চমৎকার লাগছে ওকে।

বান্ধবীকে দেখে মৃদু হাসল ল্যাভিনিয়া, উঠে দাঁড়াল। ওর

অপেক্ষার পালা শেষ। ফ্রাঙ্কিনকে নিয়ে এখন সিনেমায় যাবে। দ্রুত হাতে দরজা জানালা বন্ধ করে ফেলল। লেমোনেডের গ্লাসটা বারান্দার রেলিংয়েই পড়ে রইল। নেমে এল নীচে।

'অলস সন্ধ্যেটা সিনেমা দেখে বেশ কাটিয়ে দেয়া যাবে, কী বলো?' ফ্রাঙ্কিন উত্তরে কিছু বলার আগেই রাস্তার ওপারের বাড়িটার অন্ধকার থেকে বুড়ি হ্যানলয়ের খনখনে গলা ভেসে এল, 'তোরা কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'এলিট হলে, সিনেমা দেখতে।' ঘাড় ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় জবাবটা ছুঁড়ে দিল ল্যাভিনিয়া।

'মরে গেলেও তো রাত্তিরে আমি ঘরের বার হব না।' চেঁচাল বুড়ি, 'কার বাপু সাধ হয়েছে সেধে সেধে ওই খুনিটার খপ্পরে পড়তে। তারচে' বরং দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকব, তাও ভাল।'

ওরা কোনও জবাব দিল না। বুড়ি সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল। রাস্তাটা এখনও যেন উত্তাপ ছড়াচ্ছে। ল্যাভিনিয়ার মনে হলো ও যেন গরম তন্দুরের ওপর দিয়ে হাঁটছে আর আগুনের হল্কা কাপড়ের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পড়ছে। একফোঁটা বাতাস নেই। গাছগুলোর পাতা স্থির। চাঁদের আলোয় কালচে সবুজ দেখাচ্ছে।

'ল্যাভিনিয়া, "লোনলী কিলার" সম্পর্কে যে সব কথা বলাবলি হচ্ছে, তুমি বোধহয় ওগুলো বিশ্বাস করো না, না?' নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করল ফ্রাঙ্কিন।

'আসলে সবাই একটু বাড়িয়েই বলে।' কাঁধ ঝাঁকাল ল্যাভিনিয়া। 'হ্যাটি ম্যাকডোলিস তো খুন হলো গত মাসে, তার আগের মাসে রবার্টন ফেরি। আর এখন এলিজা রামসেল নিখোঁজ...'

'হ্যাটি ম্যাকডোলিসের খুনের ঘটনাটা গুজব ছাড়া কিছু নয়। বাজী ধরতে পারি ও কারও সাথে ভেগেছে।'

'কিন্তু যে চারটে মহিলার লাশ পাওয়া গেছে, পুলিশ বলেছে ওরা সবাই খুন হয়েছে। গলা টিপে খুন। জিভ বেরিয়ে পড়েছিল, শোনোনি?'

কথা বলতে বলতে ওরা খাদের ধারে এসে দাঁড়াল। খাদটা শহরটাকে দুই ভাগ করে রেখেছে। পেছনে ওদের নগরীর আলোকিত বাড়িঘর, রেডিওতে ভেসে আসা ক্ষীণ সঙ্গীত এবং সামনে অতলান্ত অন্ধকার, জোনাকির আলো, ঝিঁঝির ডাক আর খাদে বসানো ডায়নামোর একটানা গুমগুম শব্দ। সামনে তাকিয়ে ফ্রাঙ্কিনের কেমন ভয় ভয় করে।

'সিনেমায় গিয়ে কাজ নেই। বরং বাড়ি ফিরে যাই চলো।' বলল সে। 'কে জানে খুনীটা হয়তো সামনেই আমাদের জন্য ওঁৎ পেতে আছে। সুযোগ পেলেই জাপ্টে ধরবে।' নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সে। 'তা ছাড়া এই খাদ পেরিয়ে রাত্রিবেলা তো তোমাকেই ফিরতে হবে, ল্যাভিনিয়া। যখন ব্রিজ থেকে নামবে, হয়তো দেখবে গাছের আড়ালে খুনীটা তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে, তখন কী হবে? দিনের বেলায়ও তো আমি এই রাস্তা দিয়ে আসতে পারতাম না, বাবা!'

'ধ্যাত, কী যে বলো তুমি।' ল্যাভিনিয়া ওর ভয় এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইল।

'কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখো, পুরো পথটা তোমাকে একাই আসতে হবে। আমি ভেবে পাই না, এরকম একটা ভৌতিক খাদের পাশের বাড়িতে কী করে একা থাকো তুমি! ভয় করে না?'

'না। ভয় করে না। বরং একা থাকতেই ভাল লাগে।' বলল ল্যাভিনিয়া। আঙুল দিয়ে অন্ধকার পথটা দেখাল, 'চলো এগোই।'

'আমার ভয় করছে।'

'আহ্ হা এত ভয় পাচ্ছ কেন শুনি? সবে তো সন্ধ্যে। তোমাদের ওই "লোনলী কিলার" না কী যেন, সে এই সন্ধ্যেবেলাতেই আমাদের জন্য ঘাপটি মেরে বসে আছে ভাবছ কেন? বক বক অনেক হয়েছে। এখন চল তো।' ফ্রাঙ্কিনের হাত চেপে ধরে পা বাড়াল ল্যাভিনিয়া। ব্যাঙের কোরাস, ঝিঁঝির ঐকতান, মশার গুনগুন আর ডায়নামোর ভৌতিক শব্দ–সব মিলে পরিবেশটা ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে ফ্রাঙ্কিনের কাছে। প্রায় ফিসফিস করে বলল সে।

'চলো, দৌড় দেই।'

'না,' কঠিন গলায় বলল ল্যাভিনিয়া।

আর তক্ষুণি ঘটল ঘটনাটা।

যদি ল্যাভিনিয়া মাথা না ঘোরাত তা হলে ওটা চোখে পড়ত না। কিন্তু মাথা ঘোরানোর সাথে সাথে দেখে ফেলল সে দৃশ্যটা। আর ল্যাভিনিয়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে ফ্রাঙ্কিনও তাকাল। পাথরের মূর্তি হয়ে গেল দু'জনেই। বাঁশঝাড়ের পেছনে, অর্ধেক শরীর ভেতরে, অর্ধেকটা বাইরে নিয়ে আকাশের তারা দেখছে–এমন ভঙ্গিতে শুয়ে আছে এলিজা রামসেল। ফ্রাঙ্কিনের গলা চিরে বেরিয়ে এল চিৎকার।

চাঁদের আলোয় মুখটা পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। চোখ দু'টো সাদা মার্বেলের মত। স্থির। জিভ বেরিয়ে আছে অনেকখানি।

ল্যাভিনিয়ার মনে হলো খাদটা ওর চারপাশে বনবন করে ঘুরছে। ফ্রাঙ্কিনের ফোঁপানো কান্না যেন ভেসে আসছে অনেক

দূর থেকে। অনেকক্ষণ পর অস্ফুট কণ্ঠে কথা বলে উঠল ল্যাভিনিয়া, 'চলো। পুলিশে খবর দেব।'

'আমাকে জড়িয়ে ধরো, ল্যাভিনিয়া, আরও জোরে জড়িয়ে ধরো। ভীষণ শীত করছে আমার।' ঠক ঠক কাঁপছে ফ্রাঙ্কিন। ভয়ে। ল্যাভিনিয়া ওকে আরও কাছে টানল। পুলিশের হাঁটাচলা, কথাবার্তা, ফ্লাড লাইটের আলো সব যেন অস্পষ্ট ঠেকছে ওর কাছে। বার বার এলিজার মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। পুলিশ অফিসারের কথায় যেন সম্বিত ফিরে পেল। 'আপনারা এখন যেতে পারেন, ম্যাডাম।' বললেন তিনি। 'সকাল সকাল অনুগ্রহ করে একবার থানায় আসবেন। দু'একটা প্রশ্ন করব।'

ঘাসের ওপর শোয়ানো সাদা চাদরে ঢাকা লাশটার দিকে একবারও না তাকিয়ে ল্যাভিনিয়া এবং ফ্রাঙ্কিন হাঁটতে শুরু করল। বুকের মধ্যে এখনও ধুকধুকি থামেনি। ফ্রাঙ্কিনের মত ওরও শীত করছে।

পেছন থেকে পুলিশ অফিসারের গলা ভেসে এল, 'সঙ্গে কাউকে দেব, ম্যাডাম?'

'না, ঠিক আছে। আমরা একাই যেতে পারব।' বলল ল্যাভিনিয়া। 'আমি এখন কিছু নিয়ে ভাবব না। সে কীভাবে ওখানে পড়েছিল, কী ঘটেছিল, কোন কিছু নিয়েই আমি আর ভাবতে চাই না। আমি সব ভুলে যাব। সব ভুলে যাব।' মনে মনে বারবার কথাগুলো আওড়াল সে।

'আমি এর আগে কখনও মরা মানুষ দেখিনি।' বলল ফ্রাঙ্কিন। ওর কথা শুনতে পায়নি এমন ভঙ্গিতে ল্যাভিনিয়া ঘড়ির দিকে তাকাল। 'সাড়ে আটটা বাজে। চলো, হেলেনের বাসায় যাই। ওকে নিয়ে একসাথে ছবি দেখতে যাব।'

'ছবি দেখতে যাব!'

'হ্যাঁ। ছবিটা দেখা এখন আমাদের জন্য খুব দরকার।'

'ল্যাভিনিয়া, তুমি কি পাগল!'

'না ফ্রাঙ্কিন, আমি পাগল নই। ঠিকই আছি। এটুকু শুধু জানি একটু আগের ঘটনাটা আমাদের যে কোন মূল্যে ভুলে থাকতে হবে।'

'কিন্তু এলিজা এখনও ওখানে পড়ে আছে, আর তুমি কিনা...'

'আমাদের এখন একটু রিল্যাক্স করা দরকার, ফ্রাঙ্কিন।'

'কিন্তু এলিজা তো তোমার বন্ধু ছিল। আমারও...'

'হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু ওকে তো তুমি আর ফিরে পাবে না। বরং ওকে নিয়ে যত ভাববে, ভয় পাবে, তত খারাপ লাগবে। এখন বাড়ি গেলে ওর কথাই শুধু মনে পড়বে। ওকে নিয়ে আমি এখন একটুও ভাবতে চাই না। আমি অন্যসব কিছু নিয়ে ভাবতে রাজি আছি শুধু ওটা ছাড়া। আর তাই ছবি দেখে ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চাইছি আমি।'

খাদের পাশের পাথুরে অন্ধকার রাস্তাটা ধরে এগোচ্ছে ওরা। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নীচে, খাঁড়ির মুখের কাছ থেকে বিড় বিড় করে কে যেন বলে উঠল। 'আমি "লোনলী কিলার"। আমি "লোনলী কিলার"। আমি মানুষ খুন করি।'

'আর আমি এলিজা রামসেল। আমি মরে গেছি। দেখো, আমার জিভ বেরিয়ে আছে।'

কণ্ঠস্বর দু'টো চিনতে পেরে ফ্রাঙ্কিন চিৎকার করে উঠল, 'এই বদমাশ ছোকরারা। পালা পালা, পালা। পালা বলছি শিগ্‌গির।'

বাচ্চারা তাদের চালাকি ধরা পড়েছে বুঝতে পেরে দৌড়ে পালাল। ওদের উচ্চকিত হাসি অন্ধকারে দূর পাহাড়ের কোলে হারিয়ে গেল।

ফ্রাঙ্কিন ফুঁপিয়ে উঠল।

'আমি ভেবেছি তোমরা বুঝি আর আসবেই না।' হেলেন ওদের দেখে চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো। 'পাক্কা এক ঘণ্টা দেরি করেছ, কী ব্যাপার?'

'আমরা,' মুখ খুলতে যাচ্ছিল ফ্রাঙ্কিন, ওর বাহু খামচে ধরল ল্যাভিনিয়া।

'একটা জায়গায় আটকে গিয়েছিলাম, ভাই। কে যেন খাদের ধারে এলিজা রামসেলের লাশ খুঁজে পেয়েছে।'

হেলেন ঢোক গিলল। 'কে দেখেছে?'

'আমরা জানি না।'

কোনও কথা বলছে না কেউ। হঠাৎ যেন কেউ ওদের মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে। 'যাই, ঘরদোর ভাল করে বন্ধ করে আসি।' শেষ পর্যন্ত হেলেনই নীরবতা ভাঙল। সে ঘরের ভেতরে ঢুকতেই ফ্রাঙ্কিন ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'তুমি ওকে সত্যি কথাটা বললে না কেন?'

'কী দরকার বেচারাকে এখনই ঘাবড়ে দিয়ে। কাল ও এমনিতেই জানতে পারবে।' বলল ল্যাভিনিয়া।

রাস্তায় জন-মানুষের চিহ্নও নেই। সবাই ঘরে। জানালার পর্দা সরিয়ে কেউ কেউ বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে অন্ধকার এই রাতে তিনটি রমণী হাইহিলের খটখট শব্দ তুলে হেঁটে যাচ্ছে নির্জন রাস্তা দিয়ে।

কী অদ্ভুত! ভাবছে ল্যাভিনিয়া। "লোনলী কিলার-এর" ভয়ে

লোকজন দেখছি সব ইঁদুরের মত গর্তে লুকিয়েছে।

'আজ রাতে আমাদের বাইরে বেরুনো ঠিক হয়নি।' চিন্তিত গলায় বলল হেলেন।

"লোনলী কিলার" তিনজনকে একসাথে খুন করতে আসবে না।' বলল ল্যাভিনিয়া। 'এইমাত্র খুন করে সে আবার খুন করবে ভেবেছ? আর তিনজন যখন আছিই, এত ভয় কেন?'

হঠাৎ চমকে উঠল ওরা। সামনে গাছটার আড়ালে লম্বা একটা শরীর আবছা দেখা যাচ্ছে। একই সাথে তিনজন চিৎকার করে উঠল।

'এইবার পেয়েছি তোমাদের।' লোকটা গাছের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। হেসে উঠল হা হা করে।

'হেই, আমি সেই "লোনলী কিলার"।'

'টম ডিলন!'

'টম!'

'টম!' চেঁচিয়ে উঠল ল্যাভিনিয়া। 'ছেলেমানুষীর একটা সীমা থাকা দরকার। এভাবে ভয় দেখাতে গিয়ে গুলি খেয়ে তুমি একদিন ঠিক মারা পড়বে।'

ফ্রাঙ্কিন ইতিমধ্যে কাঁদতে শুরু করেছে।

টম ডিলনের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'এই, কাঁদছ কেন? সত্যি বলছি আমি খুব দুঃখিত।'

'এলিজা রামসেলের খবর শোনোনি তুমি?' তেতো গলায় বলল ল্যাভিনিয়া, 'সে মারা গিয়েছে। আর এদিকে তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছ। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আমাদের সঙ্গে আর কথা বলতে এসো না।'

'আ...' কী বলতে গিয়েও মুখে কথা যোগাল না টমের। দেখল রাগ করে ওরা চলে যাচ্ছে। পিছু পিছু আসতেই ঝাঁঝিয়ে

উঠল ল্যাভিনিয়া। 'ওখানেই থাকুন, মি. লোনলী কিলার। আর নিজেকে ভয় দেখাও। এলিজার মুখটা গিয়ে দেখে এসো মজা পাও কিনা।'

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রাঙ্কিন বারবার চোখের জল মুছছে দেখে বিরক্ত হলো হেলেন। 'আহ্, ফ্রাঙ্কিন। টম তো আমাদের সঙ্গে স্রেফ ইয়ার্কী করেছে। এতে ফ্যাচ ফ্যাচ করে কান্নার কী আছে?'

'ও সে জন্যে কাঁদছে না, হেলেন।' শান্ত কণ্ঠে বলল ল্যাভিনিয়া। 'এখন তোমাকে আসল ব্যাপারটা বলি। খাদটাতে আমরাই এলিজাকে প্রথম দেখি। আর সেই দৃশ্যটা মোটেই সুখকর ছিল না। ফ্রাঙ্কিন কিছুতেই ভুলতে পারছে না ব্যাপারটা। থাকগে, এ নিয়ে তুমি আর ওর সাথে যেন কথা বলতে যেয়ো না। যা হয়েছে, হয়েছে। এখন টিকেটের টাকাটা বের কর। আমরা প্রায় হলের কাছে চলে এসেছি।'

'আমাদের কিছু চাটনি দাও তো, জিম। হলে বসে খাব।' মুদি দোকানদারের বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ল্যাভিনিয়া। জিম বোয়েম খুলে চাটনি বের করতে লাগল। আড়চোখে ল্যাভিনিয়াকে লক্ষ করতে করতে বলে উঠল, 'আপনি দিন দিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন, মিস ল্যাভিনিয়া। আজ দুপুরেই একজন আপনার খুব প্রশংসা করছিল। ওই যে আপনি যখন চকলেট কিনতে এসেছিলেন তখন।'

'তাই?'

'জ্বি,' চাটনি প্যাকেট করতে করতে বকবক করে চলেছে সে। 'লোকটা কাউন্টারে বসা ছিল। আপনাকে দেখছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করল "কে উনি?" কালো সট পরা ছিল

লোকটা। লম্বাটে, শুকনো মুখ। 'কেন আপনি জানেন না? উনি হচ্ছেন আমাদের শহরের সবচে' সুন্দরী মহিলা।' বললাম আমি। "চমৎকার দেখতে উনি," বলল সে। "থাকেন কোথায়?" দোকানদার এই পর্যন্ত বলে থামল, তাকাল অন্যদিকে।

'তুমি বলনি।' আর্তনাদ করে উঠল ফ্রাঙ্কিন। 'তুমি নিশ্চয়ই ওই লোকটাকে ওর ঠিকানা দাওনি। বল দাওনি।'

'আমি খুবই দুঃখিত, ম্যাডাম।' আস্তে আস্তে বলল জিম। 'আমি তাকে ঠিকানাটা দিয়েছি। বলেছি উনি খাদটার কাছে পার্ক স্ট্রীটে থাকেন। আজ, এই একটু আগে যখন এলিজা রামসেলের খবরটা পেলাম, বুঝতে পারলাম কী ভুলটাই না করেছি।' প্যাকেট করা হয়ে গেছে, এগিয়ে দিল সে চাটনিগুলো।

'বোকা কোথাকার,' চেঁচিয়ে উঠল ফ্রাঙ্কিন। চোখে আবারও জল এসে গেছে।

'আমি দুঃখিত, ম্যাডাম, খুবই দুঃখিত। ভেবেছি ঠিকানা দিলে কোনও সমস্যা নেই।'

'সমস্যা নেই, কোনও সমস্যা নেই?' ফ্রাঙ্কিনের কান্নাভেজা কণ্ঠ বিকৃত শোনাল।

ল্যাভিনিয়ার দিকে ওরা তিনজনেই তাকিয়ে আছে। ল্যাভিনিয়া কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ওর অস্বস্তি লাগছে। যন্ত্রচালিতের মত পার্স থেকে টাকা বের করল।

'এই সসগুলোর জন্য পয়সা দিতে হবে না।' সসের ঠোঙা এগিয়ে দিয়ে বলল জিম। চোখ নীচের দিকে। মুখে অপরাধের ছাপ।

'এখন আমাদের একটাই করণীয় আর তা হলো সোজা বাড়ি ফেরা।' দোকান থেকে বেরিয়েই কথাটা বলল হেলেন,

'তোমার জন্য আমি কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নই, ল্যাভিনিয়া। ওই লোকটা তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল। তার মানে পরবর্তী টার্গেট হচ্ছ তুমি। তুমি ওই খাদের নীচে পড়ে মরে থাকতে চাও?'

'ও তো সাধারণ একটা লোক।' রাস্তার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে জবাব দিল ল্যাভিনিয়া।

'আর টম ডিলনও সাধারণ এক লোক। কে জানে ওই হয়তো সেই "লোনলী কিলার"।'

'আমরা আসলে সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছি।' এবার যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল ল্যাভিনিয়া। 'তাই কে একজন আমার ঠিকানা জানতে চাইল ওমনি তোমরা তাকে খুনী ঠাউরে ধরে নিলে আমি তার পরবর্তী টার্গেট। এটা আসলে খুব হাস্যকর শোনাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি যদি ওর পরবর্তী টার্গেট হই, তবে হব না হয়। কিন্তু সিনেমা দেখার জন্য আজ যখন বেরিয়েছি দেখবই আমি। সে তোমরা যাই মনে কর না কেন। আমার তো বাড়ি থেকে মোটেই বেরুবার সুযোগ হয় না। আজ তবু হয়েছে। ভেবেছি কোথায় তোমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময়টা কাটাব, তা নয় তোমরা বারবার ওই ব্যাপারটা টেনে এনে ভারী করে তুলছ বাতাস। আর আমি কচি খুকী নই যে নিজের বিপদ বুঝব না। পুলিশ তো এখন চোখ-কান খোলা রেখেছে। খুনীর তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এরমধ্যে নতুন করে আবার একটা ঝুঁকি নেবে। বরং আরও কয়েকটা দিন যেতে দাও, ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসুক সবকিছু, তখন হয়তো "লোনলী কিলার"-এর চেহারাটা আমরা দেখার সুযোগ পেয়ে যাব। অবশ্য আমাদের তিনজনের সামনে যদি সে তার চেহারাটা দেখাতে চায়, তবেই।' দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে হাসল

ল্যাভিনিয়া।

হেলেন ওর হাসি দেখে মোটেও খুশী হতে পারল না। শুকনো গলায় বলল, 'কিন্তু খাদের ধারে এলিজার মুখটা কি তোমার একবারও মনে পড়ে না?'

'একবার দেখার পর আমি ওর দিকে দ্বিতীয়বার তাকাইনি। ওর কথা এখন ভাবতেও চাই না। কিন্তু বার বার তোমরা ব্যাপারটা টেনে আনছ কেন, বল তো? তা ছাড়া আমি এমন আহামরি কোন সুন্দরী নই যে আমাকে নিয়ে এত চিন্তা করতে হবে।'

'কিন্তু তুমি সুন্দরী, ল্যাভিনিয়া। এই শহরের সবচে' সুন্দরী মেয়েটি হচ্ছ তুমি। যদি তুমি,' একটু থেমে আবার শুরু করল ফ্রাঙ্কিন, 'যদি তুমি বিয়ে করতে চাইতে তা হলে কত পুরুষ যে তোমার পায়ের কাছে...'

'থাক, আর বাড়িয়ে বলতে হবে না, ফ্রাঙ্কিন। বাদ দাও এসব। এই তো, সিনেমা হলে এসে পড়েছি। তুমি আর হেলেন ইচ্ছে করলে এখন বাড়ি যেতে পারো। কিন্তু আমি ছবি দেখব এবং একাই বাড়ি ফিরব।'

'ল্যাভিনিয়া, তুমি পাগল হয়েছ? আমরা তোমাকে এখানে একা রেখে যেতে পারি না।'

মিনিট পাঁচেক তুমুল তর্ক হলো ওদের। শেষমেশ ল্যাভিনিয়াকে রাজি করাতে না পেরে রেগেমেগে হাঁটতে শুরু করল ফ্রাঙ্কিন আর হেলেন। ক্ষীণ একটু আশা ছিল ওদের চলে যেতে দেখে হয়তো ল্যাভিনিয়াও পেছন পেছন আসবে। কিন্তু কয়েক পা এগোবার পর পেছনে ফিরে দেখল থমথমে মুখে ল্যাভিনিয়া ঠিকই টিকেট কিনছে। বান্ধবীর জন্য দারুণ উদ্বেগে ফিরে এল ওরা। ল্যাভিনিয়া ওদের আসতে দেখে কিছু বলল

না, মৃদু হাসল। একসাথেই টিকেট কাটল। ঢুকে পড়ল হলে।

প্রথম শো শেষ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। দ্বিতীয় শো অল্পক্ষণ বাদেই শুরু হবে। ওরা অপেক্ষা করছে কখন বাতি নিভবে। অপ্রত্যাশিতভাবে ম্যানেজারকে হাজির হতে দেখল লাল মখমলের পর্দার সামনে। বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করল সে:

'ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ। পুলিশ আজ আমাদের নির্ধারিত সময়ের আগেই ছবি শেষ করতে বলেছে। তাই আপনারা আগেই বাড়ি ফিরতে পারবেন। আজকের শোতে কোন বিজ্ঞাপন চিত্র দেখানো হবে না। সরাসরি ছবি শুরু হবে। ছবি শেষ হয়ে যাবে এগারোটায়। আপনাদের বিশেষভাবে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে কোথাও দেরি না করে সোজা বাড়ি যেতে। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের পুলিশের সংখ্যা নিতান্তই কম। তাই সব জায়গায় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। যা হোক, আমরা এক্ষুণি ছবি শুরু করে দিচ্ছি। শুভরাত্রি।'

ম্যানেজার অদৃশ্য হয়ে যেতেই পটাপট নিভে গেল বাতি। 'শুনলে তো, ল্যাভিনিয়া, শুনলে তো।' অন্ধকারের মধ্যে ল্যাভিনিয়ার দুই বাহু দু'দিক থেকে খামচে ধরল ওরা। ল্যাভিনিয়া কিছু বলল না। পর্দায় ছবির নাম ফুটে উঠেছে। তার দৃষ্টি সে দিকে।

'ল্যাভিনিয়া,' হেলেন ফিসফিস করে উঠল।

'কী?'

'আমরা যখন ভেতরে ঢুকছি তখন কালো সুট পরা একটা লোককে হলের মধ্যে ঢুকতে দেখেছিলাম। সেই লোকটা এখন আমাদের পেছনে বসা।'

'আঃ, হেলেন!'

'ও আমাদের পেছনের সারিতে ডানদিকে বসেছে।' আতঙ্কিত গলায় বলল হেলেন। ল্যাভিনিয়া চুপ করে রইল। হেলেন আস্তে পেছনে মাথা ঘোরাল। 'আমি এক্ষুণি ম্যানেজারকে ডাকব,' প্রায় কাঁদো কাঁদো গলা হেলেনের। তারপর ল্যাভিনিয়াকে বিমূঢ় করে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠল সে। চিৎকার করে বলল, 'ছবি বন্ধ করো। আলো, আলো, শিগ্‌গির আলো জ্বালো।'

'এ কী করছ, হেলেন!' হেলেনকে সিটের ওপর জোর করে বসাবার চেষ্টা করল ল্যাভিনিয়া। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে চিৎকার করেই চলেছে।

সোডার খালি গ্লাসটা ঠক করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ল্যাভিনিয়া। ওপরের ঠোঁটে সাদা ফেনা লেগে রয়েছে। জিভ দিয়ে ফেনাটা চাটতে চাটতে হাসিতে ফেটে পড়ল সে। 'কী কাণ্ডটা বাধিয়েছিলে দেখলে তো? একেবারে খালি খালি বেচারাকে বোকা বানানো। তুমি যখন 'আলো আলো' বলে চিৎকার করে উঠলে, মনে হয়েছিল লজ্জায় মরে যাব।'

'ইস, বেচারার কথা ভাব একবার।' বলল ফ্রাঙ্কিন। 'বেচারা ম্যানেজারের ভাই। এসেছে সেই রসকিন থেকে। আর তাকেই কিনা...'

আবারো হাসল ল্যাভিনিয়া।

'আমি তো ক্ষমা চেয়েইছি,' লজ্জিত গলায় বলল হেলেন।

'দেখলে তো আতঙ্কিত হলে মাথার কোনও ঠিক থাকে না।'

কথা বলে চলেছে ওরা। মাথার ওপর ফ্যানটা একঘেয়ে আওয়াজ তুলে ঘুরছে। ভ্যানিলা আইসক্রিমের মিষ্টি গন্ধ

বাতাসে। দোকানের ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজল।

'আমাদের আর দেরি করা ঠিক হবে না। পুলিশ বলেছে—'

'আরে ধুৎ বাদ দাও পুলিশের কথা।' হেলেনকে বাধা দিয়ে হেসে উঠল ল্যাভিনিয়া। 'আমি কিছু পরোয়া করি না। গিয়ে দেখো তোমার ওই "লোনলী কিলার" এখন শহর থেকে হাজার মাইল দূরে। পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে ও আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ধারে-কাছেও আসবে না। ওসব নিয়ে ভেব না তো। তারচে' বলো ছবিটা কেমন লাগল? সেই দৃশ্যটা—'

রাস্তায় একটি লোকও নেই। সিনেমা দেখতে যারা এসেছিল তাদের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। এমনকী একটা গাড়ি পর্যন্ত চলছে না। আশ্চর্য রকম নিস্তব্ধ চারদিক। গুমোট হাওয়াটা কেটে যাচ্ছে। তবুও কেমন থমথমে ভাব। কালো পিচের রাস্তাটা লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। রাস্তার পাশের লম্বা গাছগুলো চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে ভিজছে। মৃদু হাওয়ায় কদাচিৎ কেঁপে উঠছে পাতা। তিনজোড়া হাইহিলের খটখট শব্দ শুধু রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছে। তিন রমণী পাশাপাশি হেঁটে চলেছে।

'ফ্রাঙ্কিন, তোমাকে আগে আমরা বাসায় পৌঁছে দেব,' বলল ল্যাভিনিয়া।

'না, আগে তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসব।'

'বোকার মত কথা বলো না। তুমি সবচে' কাছে থাকো। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হলে একা একা খাদ পেরিয়ে ফিরতে হবে তোমাকে। আর তখন যদি ওপর থেকে একটা পাতাও খসে পড়ে গায়ে ভয়ের চোটে ওখানেই হার্টফেল করবে

তাম।'

'আমি তোমার বাসাতেও থাকতে পারি আজ। তোমাকে নিয়েই তো আমাদের বেশি ভয়।'

'না।' দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি জানাল ল্যাভিনিয়া।

আবার নীরবতা নেমে এল ওদের মধ্যে। চাঁদের আলো গায়ে মেখে হেঁটে চলেছে তিনজন। কিন্তু চারদিকের অদ্ভুত নিস্তব্ধতা অসহ্য ঠেকছে ওদের কাছে। ল্যাভিনিয়াই প্রথমে প্রস্তাবটা দিল, 'এসো, গান গাই।' হাতে হাত ধরে মিষ্টি গলায় গান শুরু করল ওরা। ওদের সুরেলা কণ্ঠ বাতাসের সাথে মিশে যেতে লাগল।

'শোনো!' গান থামিয়ে হঠাৎ বলে উঠল ল্যাভিনিয়া।

ওরা চুপ করে গেল। কানে ভেসে এল কোর্ট হাউজের ঘড়ি। পৌনে বারোটা বাজার সংকেত দিচ্ছে।

'শোনো!'

রাস্তার পাশের বাড়িটার অন্ধকার বারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ। হাঁটছে। সিগারেটের লাল আগুন ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। ওরা বাড়িটা পার হয়ে গেল। সিগারেটের আগুনের ফুলকিতে প্রতিবেশী মি. টেরেলের মুখটা দেখতে পেল এক লহমার জন্য। বারান্দায় একা হাঁটাহাঁটি করছেন তিনি।

আশপাশের বাড়িঘরগুলোর আলো একটার পর একটা নিভে যেতে শুরু করেছে। সবাই যে যার বাসায় আরামে, নিরাপদে ঘুমাচ্ছে, ভাবছে ল্যাভিনিয়া, আমরা, তিনটে মেয়ে এই গভীর রাতে নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। পায়ের নীচে আমাদের কালো রাস্তা, মাথার ওপরে নিঃসঙ্গ বাতিগুলো একাকী জ্বলছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা ফ্রান্সিনের বাসার সামনে এসে পড়ল। 'এই তো তোমার বাসায় এসে

পড়েছি, ফ্রান্সিন, এখন ঝটপট ঢুকে পড় বাসায়।' বলল ল্যাভিনিয়া।

'ল্যাভিনিয়া, হেলেন, প্লিজ, আজ রাতটা তোমরা আমার এখানেই থেকে যাও। রাত অনেক হয়েছে। মিসেস মারডকের একটা অতিরিক্ত রুম আছে। আমি তোমাদের জন্য গরম গরম চকলেট বানিয়ে দেব। তেমন অসুবিধে হবে না, প্লিজ।' অনুনয় করতে লাগল ফ্রান্সিন।

'না, ধন্যবাদ।' বলল ল্যাভিনিয়া।

সাথে সাথে কেঁদে ফেলল ফ্রান্সিন।

'আহ, ফ্রান্সিন, কান্নাকাটি কোরো না তো।'

'আমি তোমাকে জেনেশুনে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারি না, ল্যাভিনিয়া।' ফোঁপাচ্ছে ফ্রান্সিন। গাল বেয়ে টপটপ পড়ছে জল। 'তুমি এত ভাল, এত সুন্দর! আমি চাই না তুমি খুন হয়ে যাও। প্লিজ, ল্যাভিনিয়া, প্লিজ।'

'ফ্রান্সিন, লক্ষ্মী মেয়ে, শোন আমার কিচ্ছু হবে না। সত্যি বলছি কিছু হবে না। আমি বাসায় পৌঁছেই তোমাকে ফোন করব।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, এবং তোমাকে জানিয়ে দেব আমি নিরাপদেই বাড়ি ফিরেছি। আর কাল আমরা ইলেকট্রিক পার্কে যাব পিকনিক করতে, ঠিক আছে? আমি নিজের হাতে হ্যাম স্যান্ডউইচ বানাব। কেমন মজা হবে ভাব একবার।'

'তুমি সত্যি আমাকে ফোন করবে তো?'

'বললামই তো করব। বলিনি? ঠিক আছে। আসি এখন। শুভরাত্রি।'

ফ্রান্সিন ওদের গালে চুমু খেয়ে বিদায় জানাল। ল্যাভিনিয়া

আদর করে ওর গালটা টিপে দিল। কাতর দৃষ্টিতে ওর দিকে আরেকবার তাকিয়ে ফ্রাঙ্কিন ঘরের মধ্যে ঢুকল। ওরা ঘুরে দাঁড়াতেই দরজা বন্ধ করে ফেলল দ্রুত।

এবার হেলেনকে বলল ল্যাভিনিয়া, 'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছি আমি।'

হঠাৎ ঢং ঢং একটানা শব্দ ভেসে আসতে লাগল কোর্ট হাউজের ঘড়ি থেকে। শূন্য শহরের নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শব্দটা শুনছে ওরা।

'দশ এগারো বারো,' ল্যাভিনিয়া গুণছে।

'তোমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে না?' হেলেন জিজ্ঞেস করল।

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'এই যে এত রাতে যখন সবাই দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে বিছানায়, একটা কুকুর পর্যন্ত রাস্তায় নেই, আর আমরা দুটো মাত্র প্রাণী একাকী হাঁটছি। হাজার মাইলের মধ্যে আর কেউ আমাদের মত এত রাতে রাস্তায় নেই, বাজি ধরতে পারি।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা হেলেনের বাসায় চলে এসেছে। দুই বান্ধবী দীর্ঘক্ষণ একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নীরবতা ভেঙে হেলেন বলল, 'তোমাকে রাতটা এখানে কাটাবার জন্য নিশ্চয়ই বারবার করে বলতে হবে না, ল্যাভিনিয়া?'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি চলে যাব।'

'মাঝে মাঝে...'

'মাঝে মাঝে কী?'

'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় মানুষ ইচ্ছে করেই মৃত্যুকে কাছে টানে। সারাটা সন্ধ্যা ধরে তোমার অদ্ভুত আচরণ দেখে এখন আমার তাই মনে হচ্ছে।'

'আমি ভয় পাইনি।' বলল ল্যাভিনিয়া। 'আর যথেষ্ট সাবধানও আছি। আমি মাথা খাটিয়ে চলি, বুঝলে? "লোনলী কিলার" শহরে আছে বলে মনে হয় না। সে জানে পুলিশ এখন চোখ-কান খোলা রেখেছে।'

'আমাদের পুলিশ? আমাদের ওই জং-ধরা পুলিশ বাহিনী? দেখো গিয়ে ওরা এখন নাকে তেল দিয়ে কানে তুলো গুঁজে ঘুমাচ্ছে।'

'তুমি আসলে অযথাই ভয় পাচ্ছ, হেলেন। যদি সত্যিই এরকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকত আমি নিশ্চয়ই রাতটা তোমার সাথে থেকে যেতাম।'

'কে জানে তোমার অবচেতন মনের বোধ হয় খুব শখ হয়েছে মৃত্যু কি জিনিস দেখবে।'

ল্যাভিনিয়া মৃদু হাসল শুধু। কিছু বলল না।

'আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে, ল্যাভিনিয়া। আমি এখানে বসে যখন গরম কফি খাব তখন তুমি হয়তো ওই অন্ধকার খাদ পার হবে। ভাবতেই কেমন ভয় লাগছে।'

'যাক আর ভয় পেতে হবে না। আমার নাম করে আরেক কাপ কফি খেয়ে নিও, কেমন? আচ্ছা চলি।'

ল্যাভিনিয়া নেব মধ্যরাতের জনমানবশূন্য রাস্তা দিয়ে একাকী হাঁটছে। রাত আরও নিঃশব্দ এবং অন্ধকার হয়ে উঠছে। কোনও বাড়িতেই আলো জ্বলছে না। চাঁদ এখন মাঝ আকাশে। গাছগুলোর ছায়া পড়েছে রাস্তায়। প্রকাণ্ড দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। নিঃশব্দ রাতের বুকে জুতোর খটখট আওয়াজ তুলে

হেঁটে যাচ্ছে ল্যাভিনিয়া। দূর থেকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ ডেকে উঠল। আওয়াজটা প্রকট হয়ে বাজল ল্যাভিনিয়ার কানে। আর মাত্র পাঁচ মিনিট, ল্যাভিনিয়া ভাবছে, তারপরই আমি বাড়ি পৌঁছে যাব। আর বাড়িতে ঢুকেই খুকুমণি ফ্রাঙ্কিনকে ফোন করব। আর–

ল্যাভিনিয়া নেব কান খাড়া করল, কে যেন গান গাইছে। অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছে কানে। এত রাতে কে গান গায়? হাঁটার গতি দ্রুত হলো ল্যাভিনিয়ার। সামান্য এগোতেই লোকটাকে দেখতে পেল সে। হেলেদুলে আসছে।

যদি দরকার হয় আমি এখুনই এক ছুটে আশপাশের কোনও বাড়িতে গিয়ে জোরে কড়া নাড়ব। ভাবল ল্যাভিনিয়া। দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটা 'মুন ইন দা স্কাই' গাইতে গাইতে আসছে। হাতে লম্বা লাঠি। কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল। 'আরে, মিস নেব! আপনি এত রাতে বাইরে!'

'অফিসার কেনেডি!'

'এত রাতে বাইরে থাকা ঠিক নয়, মিস নেব। চলেন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

'ঠিক আছে, মি. কেনেডি। কিছু মনে করবেন না, আমি একাই যেতে পারব।'

'কিন্তু আপনাকে তো ওই খাদটা পার হতে হবে।'

হ্যাঁ। ল্যাভিনিয়া ভাবল। কিন্তু খাদটা আমি কোনও পুরুষের সাথে পার হতে চাই না। আমি কীভাবে বুঝব এই লোকই সেই লোনলী কিলার কিনা? এর সাথে যাওয়া মোটেও উচিত হবে না আমার।

'না, ধন্যবাদ।' আবার বলল সে।

'ঠিক আছে,' বলল কেনেডি। 'আমি এখানেই আছি।

কোনও সমস্যা হলে একটা শুধু আওয়াজ দেবেন। সাথে সাথে চলে আসব।'

ল্যাভিনিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কেনেডি আবার গুন গুন করে গান ভাঁজতে শুরু করেছে।

এইবার এসে পড়েছি, ভাবল ল্যাভিনিয়া। এই তো খাদ। খাদের ঢালের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে। এখান থেকে ওর বাড়ি ঠিক তিন মিনিটের পথ। গুণে গুণে একশো তেত্রিশবার পা ফেললেই খাদের ওপরের একশো গজ লম্বা সেতুটা পার হয়ে বাড়ি পৌঁছুতে পারবে সে। এখন থেকে তিন মিনিটের মধ্যে, ভাবল ও, আমি দরজার তালা খুলতে যাচ্ছি। এই একশো আশি সেকেন্ডের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ঘটবে না।

পা ফেলতে শুরু করল ল্যাভিনিয়া।

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়। ফিসফিস করছে সে। পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ, জোরে জোরে গুণছে ও। পাঁচ ভাগের একভাগ পথ পার হয়েছি। নিজেকে কথাগুলো শোনাল। খাদটাকে গভীর আর ভীষণ কালো মনে হচ্ছে। যেন ওকে গিলে খাওয়ার জন্য হাঁ করে আছে। মনে হচ্ছে শুধু এই খাদটা ছাড়া কোথাও কিছুর অস্তিত্ব নেই।

এখন পর্যন্ত কিছু ঘটেনি। ঘটেছে কি? আমার চারধারে কেউ নেই, আছে কি! এই ফেললাম চব্বিশ পা, এই পঁচিশ। আচ্ছা, ল্যাভিনিয়া, তোমার কি সেই ভূতের গল্পটা মনে আছে? নিজের মনে কথা বলছে ল্যাভিনিয়া। ভুলেও তাকাচ্ছে না পেছন দিকে। সমস্ত নজর পায়ের দিকে। ওই যে সেই গল্পটা–এক ছায়ামূর্তি তোমার দোতলার শোবার ঘরের দিকে আসছে। এক পা ফেলল. এইবার দুই পা। এখন সে তৃতীয় পা ফেলছে. এই

পাঁচ। ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে কাছে, আরও কাছে। বারো নম্বর পা ফেলছে, ক্যাঁচ শব্দে তোমার ঘরের দরজাটা খুলে যাচ্ছে, তোমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এইবার ধরে ফেলল তোমাকে।

নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠেছে ল্যাভিনিয়া। থমকে দাঁড়িয়েছে। ব্রিজের কাঠের রেলিং খামচে ধরল। ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে বুকের ভেতর। ড্রামের বাড়ি পড়ছে যেন।

ওই যে, ওই তো সেই লোকটা! ব্রিজের তলায় দাঁড়ানো। আবারও মুখ হাঁ হয়ে গেল ল্যাভিনিয়ার, চিৎকার করতে যাচ্ছে। কিন্তু গিলে ফেলল চিৎকারটা। কই, কেউ নেই তো! ফকফকা জ্যোৎস্নায় সুনসান চারদিক। হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছল ল্যাভিনিয়া। ইস, কী বোকা আমি! ভাবল ও, নিজের গল্প নিজেকে শুনিয়ে খামোকা ভয় পেলাম। এই তো বাড়ির কাছে চলে এসেছি। আটত্রিশ, ঊনচল্লিশ, চল্লিশ, একচল্লিশ। প্রায় অর্ধেকটা পথ এসে পড়েছি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যাভিনিয়া।

একটা শব্দ হলো না?

পা ফেলল ও, হ্যাঁ, তাই তো। শব্দ হচ্ছে। পেছন থেকে আসছে শব্দটা। আবার পা তুলল ও ফেলল। সাথে সাথে শব্দটা হলো। ওর পায়ের সাথে তাল মিলিয়ে কে যেন পা ফেলছে।

'কেউ আমার পিছু নিয়েছে,' শিউরে উঠল ল্যাভিনিয়া। ভয়ে পেছন ফিরে তাকাতে পারল না।

আরেক পা ফেলল ও। আরেকটা।

পেছনের লোকটাও একই সাথে পা ফেলল।

'অফিসার কেনেডি? আপনি?' গলা কেঁপে উঠল ওর।

কোন উত্তর নেই।

হঠাৎ ঝিঁঝির ডাক থেমে গেল। ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ

কোরাস বন্ধ হয়ে গেল। বাতাস ফিসফিস করে উঠল, কে? কে? কে? তারপর নিশ্চুপ হয়ে গেল। গাছের পাতাগুলো স্থির, উৎকণ্ঠিত। চাঁদ উঁকি মেরে দেখতে চাইল কী হচ্ছে, বিশাল এক টুকরো কালো মেঘ তাকে ঢেকে ফেলল। অন্ধকার আরও গাঢ় হলো। রাত কান পাতল। বহুদূরের এক লোক পুরানো স্টেশনের এক কোনায় ট্রেনের জন্য অলস অপেক্ষায় টিমটিমে বাতিতে খবরের কাগজ পড়ছে। তারও হঠাৎ কান খাড়া হয়ে উঠল। শব্দটা সেও শুনতে পেয়েছে। ধুপধাপ ধুপধাপ। কীসের শব্দ এটা? আফ্রিকার আদিম ঢাক? না, এ তো ল্যাভিনিয়া নেবের হৃৎপিণ্ডের শব্দ। ধুপধাপ ধুপধাপ। সারা প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়ে শুনছে। ধুপধাপ ধুপধাপ।

পালাও, ল্যাভিনিয়া, বাঁচতে হলে পালাও!

'আরেকটু, মাত্র একটু,' কাতরে উঠল ল্যাভিনিয়া। একশো দশ, এগারো, বারো, তেরো। এই তো এসে গেছি। এখন দৌড়াও। ব্রিজ ধরে দৌড়াও। নিজেকে অনুনয় করছে ল্যাভিনিয়া। আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে সারা শরীর। চোখ বিস্ফারিত, বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা। তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে গলা। ওর পা দ্রুত উঠছে, নামছে। পিছু পিছু সেও আসছে। একই তালে পা তুলছে, পা নামাচ্ছে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ বিস্ফোরণের মত বাজছে ল্যাভিনিয়ার কানে।

না, তাকিয়ো না। তুমি পেছনে কিছুতেই তাকিয়ো না। তাকালে আর নড়তে পারবে না। তুমি ভয় পাবে, ল্যাভিনিয়া। প্রচণ্ড ভয়ে পাথর হয়ে যাবে। ও তোমাকে ধরতে আসছে। ধরা দিয়ো না। কিছুতেই না। দৌড়াও! দৌড়াও! দৌড়াও!

ব্রিজ পার হয়ে গেল ল্যাভিনিয়া।

ঈশ্বর! ওহ্ ঈশ্বর! আরেকটু শক্তি তুমি আমাকে দাও। আমি

যদি চিৎকারও করি কেউ সে চিৎকার শুনবে না। এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার সব গিলে খাবে। ঈশ্বর, আমাকে আরেকটু শক্তি দাও! আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও। আমি আর কোনদিন এভাবে একা বেরুব না। আমি ভুল করেছি, ঈশ্বর। মস্ত ভুল করেছি। আমি বোকা, মস্তবোকা। আর কখনও ফ্রান্সিন আর হেলেনকে ছাড়া কোথাও যাব না। তোমার পায়ে পড়ি ঈশ্বর, আরেকটু শক্তি দাও। ওই তো, ওই তো আমার বাড়ি। এই এই এসে পড়েছি।

এক দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে উঠোনে চলে এল। বাড়িটা আর মাত্র কয়েক গজ দূরে। অথচ মনে হচ্ছে কত দূর! পা ভারী হয়ে উঠেছে ওর। আতঙ্কে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ, বুক ওঠানামা করছে দ্রুত। খালি লেমোনেডের গ্লাসটা চোখে পড়ল। আগের জায়গাতেই আছে। শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে বারান্দায় উঠে পড়ল ও। কাঁপা কাঁপা হাতে চাবি ঢোকাল তালায়। ঈশ্বরের দোহাই, খোল, খুলে যা বিড়বিড় করছে ও। ক্লিক করে খুলে গেল তালা। এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলল ল্যাভিনিয়া। ঢুকল ভেতরে। বিদ্যুৎগতিতে বন্ধ করল আবার। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল। ড্রামের বাড়ি পড়ছে বুকে। আহ্ বাড়ি, আমার বাড়ি। পরম তৃপ্তিতে চোখ বুজে আছে ল্যাভিনিয়া। কী যে ভাল লাগছে এখন। আর কখনও একা বাইরে যাব না। কখনও না। চোখ মেলল ও। তাকাল বাইরে। অমল ধবল জ্যোৎস্না খাঁ খাঁ করছে উঠোনে। কেউ নেই। কেউ নেই কেন! তবে কি আমি অহেতুক ভয় পেলাম। কেউ তা হলে আমার পিছু নেয়নি! শুধু শুধু ভয় পেয়ে এতখানি পথ দৌড়ে এলাম। কী বোকা আমি! নিশ্চয় কেউ আমার পিছু নেয়নি। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই ভয় পেয়েছি। যা বাবা!

এমন ভয় জীবনে পাইনি। যাকগে, এখন কী যে ভাল লাগছে আমার। আহ আরাম! বুক ভরে দম নিল ল্যাভিনিয়া, সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাত বাড়াল লাইটের সুইচের দিকে, বাড়িয়েই থাকল, যেন জমে গেছে হাতটা। খসখসে শব্দটা শুনতে পেয়েছে ও।

'কে?' আতঙ্কে বিকৃত শোনাল ওর কণ্ঠ। 'কে? ওখানে কে? ওর পেছনে, অন্ধকার লিভিং রুমে কে যেন গলা খাঁকারি দিয়ে উঠল...'

মূল: রে ব্রাডবারী'র 'দ্য হোল টাউন ইজ স্লীপিং'।

গেকো

রান্নাঘরের বাতি জ্বালল জিসান। শিউরে উঠল দৃশ্যটা দেখে। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দিশেহারা হয়ে মেঝেতে হুড়োহুড়ি করে ছুটে পালাচ্ছে আরশোলার দল। একটা গিয়ে ঢুকল গ্যাসের চুলোর নীচে, আরেকটা আলমারির আড়ালে সেঁধুলো। দুটোকে ফ্রিজের পেছনে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল ও।

আরশোলা দেখে পেট গুলিয়ে উঠল জিসানের। খিদে পেয়েছিল ওর। ফ্রিজে স্যান্ডউইচ বা কেক আছে কিনা দেখতে এসেছিল। আরশোলা দেখে উবে গেছে খিদে। স্যান্ডউইচের মধ্যে যদি আরশোলা ঢুকে থাকে? কিংবা কেকের খোলা প্যাকেটের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকে কুৎসিত জীবটা। ওর সাড়া পেয়ে ফরফর করে বেরিয়ে আসে!

বাতি নিভিয়ে দিল জিসান। পা টিপে টিপে চলে এল ড্রইংরুমে। ছোট ঘরটার সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। ভাবছে কয়েদখানার চেহারা এর চেয়ে নিশ্চয় ভাল নয়। কেন যে এ শহরে মরতে এল ও! এখানে ওর পরিবার নেই, নির্বান্ধব পরিবেশ। বড্ড একা ও। এ বাড়িতে একাকীত্বের ষোলোকলা পূর্ণ হত যদি আরশোলাগুলো না থাকত। ওর অ্যাপার্টমেন্ট শতশত আরশোলায় ভরতি।

আরশোলার কারণে নিজের বাড়িতে নিজেকেই বন্দি মনে হয়। আগে জুতো কিংবা খবরের কাগজের বাড়ি মেরে আরশোলা নিধনের চেষ্টা করত জিসান। কিন্তু ওগুলো খুব চালাক, ছোটেও দ্রুত। চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যায়। রান্নাঘর, ড্রইং, বেডরুম—কোথায় নেই আরশোলা। সব জায়গায় গিজ গিজ করছে। আরশোলার যন্ত্রণায় সারাক্ষণ অস্থির থাকে ও। শুধু ঘুমুবার সময় কুৎসিত জীবগুলোর চিন্তা দূর হয়ে যায় মাথা থেকে।

জিসান বিছানায় শুয়ে আজকের খবরের কাগজটা তুলে নিল হাতে। সাবধানে খুলল কাগজের ভাঁজ। সেদিন কাগজের ভাঁজ খুলতেই লাফিয়ে নেমে এসেছিল ঘিনঘিনে জীবটা। তবে আজ কোন আরশোলা বেরুল না। হেডলাইন এবং সম্পাদকীয়তে চোখ বুলিয়ে দ্বিতীয় পাতায় চলে গেল জিসান। একটা হেডলাইন নজর কাড়ল। সামনে ঝুঁকল ও, পড়ে ফেলল লেখাটা। নার্ভাস হাসি ফুটল মুখে। জ্যাকেটের পকেট থেকে নোটবই বের করে টুকে নিল ঠিকানা। ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে লিখল **গেকো**।

সারাদিন লেখাটার কথাই শুধু ভাবল জিসান। বিকেল পাঁচটায় অফিস ছুটির পরে দোকানটিতে গেল। অফিসে আসা-যাওয়ার পথে দোকানটার দিকে বহুবার অলস চোখে তাকিয়েছে জিসান। কোনওদিন ভাবেনি এখানে আসতে হবে। দরজা খুলে দোকানে ঢুকল ও। এখানে মাছ, পাখি, কুকুরসহ নানা জন্তু বিক্রি করা হয়। করিডর পার হয়ে দোকানের পেছন দিকে চলে এল জিসান।

এদিকে একটা কাঁচের ঘরে নানা আকারের সাপ। তার পাশের কাঁচের ঘরটিতে বসে আছে গেকো। জিসান যা ভেবেছিল তার চেয়ে আকারে অনেক বড়। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল গিরগিটি,

জিসানের দিকের কাঁচে শরীর নিয়ে লেপ্টে রইল। বিতৃষ্ণা আর মুগ্ধতা নিয়ে গিরগিটির আঠাল পা দেখল জিসান। লেখাটায় পড়েছে জিসান এরকম পা নিয়ে ছাদ বাইতেও সমস্যা নেই গেকোদের।

গেকোর ঠাণ্ডা চাউনি আর আঁশে ভরা শরীর দেখে জিসানের গা কেমন শিরশির করে উঠল। ওটার নীচে একটা সাইনবোর্ড: **আরশোলা হত্যাকারী**। এ জন্যই এ দোকানে এসেছে ও অদ্ভুত প্রাণীটাকে দেখতে। খবরের কাগজে জিসান পড়েছে একটা গেকো এক রাতেই দশ, বিশ এমনকী ত্রিশটি পর্যন্ত আরশোলা সাবাড় করতে পারে। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল খাওয়ার পরে গেকো তৃপ্তির তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছাড়ে। জিসান শেষবারের মত তাকাল গিরগিটির দিকে। সিদ্ধান্ত নিল এটা আকারে যতই বড় আর কুৎসিত হোক, কিনবে সে। দোকানের এক কর্মচারী এগিয়ে এল জিসানকে দেখে। জিসান জানতে চাইল স্বাভাবিক আকারের অন্য কোনও গিরগিটি আছে কিনা। কর্মচারী স্বীকার করল এ প্রাণীটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বড়ই। তবে, যুক্তি দেখাল সে, আকারে বড় বলে ওর খিদেও বেশি। ফলে আরশোলাও খাবে বেশি বেশি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে জিসান জানাল সে গেকোটিকে কিনবে।

বাড়ি ফিরে আলো জ্বালাতেই আরশোলাদের ফরফর দৌড় শুরু হলো। কমপক্ষে দশটা আরশোলা ছিল দরজার সামনেই। দরজা খুলে আলো জ্বালাতেই লিভিং রুমের আসবাবের নীচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। দাঁতে দাঁত ঘষল জিসান। গেকোটাকে ডাইনিং টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। গিরগিটি প্লাস্টিকের খাঁচার এক পাশে লাফ মেরে চলে এল।

সবুজ চোখের ভূতুড়ে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জিসানের দিকে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কোট খুলে ফেলল জিসান। একটা চেয়ার নিয়ে বসল গেকোর সামনে। জ্যাকেটের পকেট থেকে গতরাতের খবরের কাগজটি বের করল। আরেকবার চোখ বুলাল বিজ্ঞাপনে: *শহরবাসীকে আরশোলার অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে যথার্থ পোষ্য প্রাণী: ক্ষুধার্ত গেকো।* জিসান দ্বিতীয়বার লেখাটা পড়ল। ওতে গেকোকে নিয়ে কী করতে হবে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনের লেখক বলছেন, গেকোটাকে বাড়িতে ছেড়ে দিলেই ডিউটি শেষ। তবে অন্যান্য পোষা প্রাণীদের যে রকম যত্ন নিতে হয় এর জন্য তার দরকার নেই। আরশোলা বা তেলাপোকা খেয়েই বেঁচে থাকে গেকো। গেকোর মালিক তার চেহারা খুব কমই দেখতে পাবেন। কারণ গেকো আসবে রাতের অন্ধকারে—শিকার ধরতে।

খবরের কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রাখার সময় জিসান লক্ষ করল ওর হাত কাঁপছে। খানিক দ্বিধায় ভুগে সে প্লাস্টিকের খাঁচার ঢাকনি খোলার জন্য হাত বাড়াল। ঢাকনিটা ধরতেই গেকো লাফিয়ে উঠে ওটার সঙ্গে সেঁটে রইল। ঝাঁকি খেয়ে ঢাকনা থেকে হাত সরিয়ে নিল জিসান। তাকিয়ে রইল কদাকার প্রাণীটার দিকে। এ ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়াবে ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল ওর। এমন সময় চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। একটা তেলাপোকা দ্রুত ছুটে যাচ্ছে মেঝে দিয়ে। আর দ্বিধা রইল না জিসানের মনে।

জিসান চট করে খুলে ফেলল প্লাস্টিকের ঢাকনা। উজ্জ্বল আলোর নীচে এক মুহূর্ত নিথর রইল গেকো। আঁশে ভরা লেজটা ডানে-বামে নাড়ছে। ঘরের চারপাশে ঘুরছে ওটার সবুজ চোখ। তারপর হঠাৎ খাড়া হলো ওটা। মেঝেতে ছুটে যাওয়া একটা তেলাপোকাকে উদ্দেশ্য করে লাফ দিল, ধাওয়া করল ওটাকে।

দুটো শরীরই অদৃশ্য হয়ে গেল ফ্রিজের নীচে।

চুপচাপ বসে রইল জিসান। ভাবছে গিরগিটিটাকে ছেড়ে দেয়া কী উচিত হলো। আরশোলাসহ ওটা এখন তার বাড়ির অন্ধকার কোণে লুকিয়ে আছে। খবরের কাগজে মনোনিবেশের চেষ্টা করল ও। মন বসল না। সিধে হলো জিসান। ঢুকল রান্নাঘরে। রান্না করবে।

খাবার নিয়ে বসার ঘরে চলে এল ও। টিভির সামনে বসে খেতে লাগল। মাঝরাত পর্যন্ত একটা সিনেমা দেখল। গেকোর কথা ভুলিয়ে দিল ছবি। ছবি শেষ হলে ঢুকল শোবার ঘরে। ঘুমাবে।

বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল জিসান। ঘুম আসছে, অদ্ভুত একটা কচরমচর শব্দ হঠাৎ বাড়ির নীরবতা ভেঙে দিল। কচরমচর, কচরমচর, কচরমচর। আড়ষ্ট হয়ে গেল জিসান, ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল বিছানায়। খাড়া করল কান। শব্দটা শুনতে পেল আবার। কচরমচর, কচরমচর, কচরমচর। এক সেকেন্ড পরে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল রাতের নৈশব্দ। ভয়ানক নাড়া খেল জিসানের নার্ভ। গেকো, গেকো, গেকো।

গেকোর তীক্ষ্ণ গলার চিৎকারে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল জিসানের। বিছানায় লম্বা হলো ও, কাঁথাটা টেনে দিল মুখের ওপর। পত্রিকার লেখাটার কথা মনে পড়েছে। শিকার দিয়ে রসনা মেটানোর পর গেকো তৃপ্তির জানান দেয় চিৎকার করে। তাই বলে এমন ভয়ঙ্কর চিৎকার? গেকোটা সাইজে অবশ্য বেশ বড়। তাই হয়তো চিৎকারটাও অমন জোরাল। কচরমচর, কচরমচর, কচরমচর। আরেকটা আরশোলা চিবুচ্ছে গেকো। শব্দটা চকবোর্ডের গায়ে পেরেক ঠোকার মত মগজে বাড়ি মারছে জিসানের। বালিশ দিয়ে কান ঢাকল ও। কিন্তু ভীতিকর শব্দটা

থামল না। পরদিন সকালে বাথরুমে ঢুকে আয়নায় নিজেকে দেখল জিসান। সাদা, পাণ্ডুর একটা মুখ। বিধ্বস্ত এই চেহারা আজ হয়তো অনেকের মনে প্রশ্নের সৃষ্টি করবে। কীভাবে সারাটা দিন কাটাবে ভেবে পেল না জিসান।

বিকেল পাঁচটায় যথারীতি অফিস থেকে বেরুল জিসান। বাড়ির পথ ধরল। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি আসতে মন্থর হয়ে এল গতি। ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না। ওখানে অন্ধকারে গেকোটা অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

একটা হোটেলে ঢুকল জিসান। একটু তাড়াতাড়িই সেরে নিল রাতের খাবার। তারপর উদ্দেশ্যহীন ভাবে কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াল। রাত ন'টা নাগাদ ঢুকে পড়ল মধুমিতায়। এক টিকেটে দু'টি ইংরেজি ছবি। রাত বারোটায় শো ভাঙল। বাসে উঠল জিসান। এবার বাড়ি ফিরতেই হয়।

ওর ফ্ল্যাট নীচতলায়। গেটের ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তালা খুলল। নীচতলার আলো জ্বালল। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেঙে দিল নীরবতা। লাফিয়ে উঠল জিসান। মাথার ওপর ছাদে তাকাল। ডোরাকাটা দাগ নিয়ে গেকোর শরীরটা লেপ্টে রয়েছে ছাদের গায়ে। আধমরা একটা আরশোলা চিবুচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড আতঙ্ক নিয়ে ওদিকে তাকিয়ে রইল জিসান। মনে হলো আকারে খানিকটা বেড়ে গেছে গিরগিটি। ওর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন পেট ভরেনি, ক্ষুধার্ত। জিসান এক দৌড়ে ঢুকল বেডরুমে। চট করে বন্ধ করে দিল দরজা। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। গেকোটা ওর পেছন পেছন নিশ্চয় শোবার ঘরে ঢুকতে পারেনি, নিজেকে বুঝ দিল ও। এখানে ও নিরাপদ।

নার্ভাস ভঙ্গিতে জামাকাপড় ছাড়ল জিসান। শুয়ে পড়ল

বিছানায়, কাঁপুনি কমেনি এখনও। মন স্থির করে ঘুমাতে চেষ্টা করল। মনে মনে বলল আজ রাতে কোন কচরমচর শব্দ শুনব না আমি, কোন ভূতুড়ে চিৎকার শুনব না। আজ রাতে শান্তিতে ঘুমাব।

ঠিক তখন আঁধার ভেদ করে যেন বেরিয়ে এল শব্দটা, কচরমচর, কচরমচর, কচরমচর। আতঙ্কে চিৎকার দিল জিসান। গিরগিটিটা ঘরের কোথাও আছে। শিকার করছে। খাচ্ছে। কাঁথা দিয়ে মাথা ঢাকল ও। কিন্তু গেকোর চিৎকার ঠেকাতে পারল না পাতলা কাঁথা।

পরদিন সকাল। চা খাচ্ছে জিসান। কাল রাতেও ঘুমাতে পারেনি ও গেকোর ভয়াল চিৎকার আর ভীতিকর কচরমচর শব্দে। তবে আজ সকালে রান্নাঘরে শুধু একটা আরশোলা চোখে পড়েছে জিসানের। বাথরুমে একটাও নেই। গেকোটা নিশ্চয়ই রাতের বেলা ওগুলোকে সাবাড় করেছে।

জিসান দেখতে পেল গেকো তার শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরে ঢুকল। বহু কষ্টে আর্তনাদ ঠেকাল জিসান। গিরগিটিটা এক রাতের মধ্যে আয়তনে বেড়ে গেছে আরও। ফ্রিজের নীচে ঢুকতে পারছে না। মাথায় একটা অশুভ চিন্তা আসতে চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল জিসান। সবগুলো আরশোলা খাওয়ার পরে গেকোটা কী করবে?

এক সপ্তাহ না যেতেই জিসানের বাড়ির সমস্ত আরশোলা সাফ। ফ্রিজের নীচে সবচেয়ে বেশি থাকত ওগুলো। তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল জিসান। একটাও নেই। রাতের বেলা এখন আর আরশোলা দৌড় ঝাঁপ দেয় না। বাথরুমের ময়লার ঝুড়ি কিংবা খবরের কাগজের মধ্যেও আর লুকিয়ে থাকে না। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে জিসান গেকোর কচরমচর আওয়াজ বেড়ে গেছে

কয়েকগুণ। তবে রাতের বেলা শব্দটা কমই হয়। তবু ঘুম আসে না ওর। ইদানীং নীরবতা ওকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেক রাত জেগে টিভি দেখল জিসান। চোখ জ্বালা করে উঠতে বন্ধ করল টেলিভিশন। বিছানায় শুয়ে পড়ল। গেকোর কচরমচর শোনার অপেক্ষা করছে। কিন্তু কবরের মত নিস্তব্ধ ঘর। গেকোটা কোথায় গেল? ভাবল জিসান। ফ্রিজের নীচে ধুলো ভরা মেঝেতে ঘাপটি মেরে বসে আছে? নাকি টিভির পিছনে? অথবা এই বেডরুমের কোনও অন্ধকার কোণে। হয়তো এ মুহূর্তে শোবার ঘরের ছাদে নিঃশব্দ পায়ে হাঁটছে ওটা পেটে প্রবল খিদে নিয়ে।

পরদিন ভোরে পুলিশ দরজা ভেঙে জিসানের ঘরে ঢুকল। জিসানের এক প্রতিবেশী থানায় ফোন করে বলেছে জিসানের ঘর থেকে ভয়ঙ্কর, অমানুষিক একটা চিৎকার শুনতে পেয়েছে সে। তারপর বিকট কচরমচর আওয়াজ এবং সবশেষে রক্ত হিম করা একটা অদ্ভুত ডাক।

জিসানের ঘর তল্লাশি করল পুলিশ। আজব ব্যাপার, জিসানকে কোথাও পাওয়া গেল না। তবে সে যে বিছানায় শুয়েছিল তা চাদরে অসংখ্য ভাঁজ দেখে বোঝা যায়। পুলিশ সব জায়গায় জিসানকে খুঁজে বেড়ালেও বিছানার নীচে উঁকি দিতে ভুলে গিয়েছিল। উঁকি দিলে দেখতে পেত মুখে রক্ত, পেটটা ফুলে আছে বেঢপ ভাবে, অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ মেলে তৃপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে একটা মস্ত গিরগিটি।

জেরি স্টাম্পার-এর 'গেকো' অবলম্বনে।

ওরা আসছে

সোমবারের এক বিকেলে দ্রুত বাসায় ফিরলেন মি. ব্লিস। আর এটা ছিল মস্ত একটা ভুল।

খুব মাথা ধরেছিল মি. ব্লিসের। তাঁর সেক্রেটারি মি. ব্লিসকে নানা ওষুধ দিয়ে, শেষে সহানুভূতির সুরে বলল, 'আজকের দিনটা রেস্ট নিচ্ছেন না কেন, মি. ব্লিস?'

সবাই তাঁকে মি. ব্লিস বলে সম্বোধন করে। অন্যান্য অফিসে হয়তো ডেভ, ড্যান কিংবা চার্লি বলে বসদেরকে সম্বোধন করা হয়, কিন্তু তিনি শুধুই মি. ব্লিস। সম্বোধনটা মন্দ লাগে না তাঁর, মাঝে মাঝে ভাবেন তাঁর বউও হয়তো একদিন মি. ব্লিস বলে ডাকবে।

কিন্তু সে ঈশ্বরকে ডাকছিল।

উঁচু গলা শোনা যাচ্ছিল তার। প্রায় আর্তনাদের মত। দোতলার বেড রুম থেকে। তবে ব্যথায় চিৎকার করছিল এমন কিছু নয়। তা হলে মি. ব্লিস ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতেন।

তার বউ একা নয়; আরেকজন, পুরুষ কণ্ঠও ঘোঁতঘোঁত করছিল সমানে। মি. ব্লিসের মুখে আঁধার ঘনিয়ে এল।

ওভার কোট না খুলেই তিনি পা টিপেটিপে ঢুকে পড়লেন কিচেনে. তারপর র‍্যাক থেকে একটা জাপানী ছুরি তুলে

নিলেন। টিভি বিজ্ঞাপন দেখে এ জিনিস তাঁর স্ত্রী তাঁকে আনতে বলেছিল। তরিতরকারী কাটতে কিংবা মাংসের ফালি করতে এ ছুরির বিকল্প নেই, গ্যারান্টিও দেয়া হয়েছে সারা জীবনের। মি. ব্লিস পেছন ফিরলেন র‍্যাক থেকে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন, বেছে নিলেন আরেকটি ছুরি। প্রথমটি যে ঈশ্বরকে ডাকছিল তার জন্য, অপরটি পশুর মত গোঙাতে থাকা দ্বিতীয়জনের জন্য।

একটু ভেবে বাড়ির পেছনের সিঁড়ি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন মি. ব্লিস। এ সপ্তাহে এই প্রথমবারের মত উত্তেজনা বোধ করছেন তিনি, মাথা ধরাটাও চলে গেছে।

ধীরে, একেকবারে দুই সিঁড়ি বাইতে শুরু করলেন তিনি। একটা সিঁড়ি আছে বিশ্রী ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে, তবে ঠিক কোন্‌টা মনে করতে পারলেন না মি. ব্লিস। ভয় হলো ওটাতে নির্ঘাত পা দিয়ে ফেলবেন।

তবে সিঁড়ি ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ করলেও কিছু এসে যাবে না। কারণ দোতলা থেকে ভেসে আসা গোঙানি আর শীৎকারের আওয়াজ ক্রমে চড়া হয়ে উঠেছে, মি. ব্লিস ভাবলেন এ মুহূর্তে ব্যান্ড বাজালেও ওই দুইজনকে তাদের কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব নয়। ওরা চরম কিছু একটা পেতে চলেছে আর তা পাবার আগেই ওখানে হাজির হয়ে যেতে চান তিনি।

বাড়ির গোটা টপ ফ্লোর জুড়ে শোবার ঘর। তরুণী স্ত্রীকে মুগ্ধ করতে, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বেড রুমটাকে বড় করেছেন মি. ব্লিস। বেড রুমের সামনের সিঁড়ি কার্পেট দিয়ে মোড়ানো।

সেই অভিশপ্ত সিঁড়িতে পা পড়ল মি. ব্লিসের এবং যথারীতি ওটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে তীব্র আপত্তি জানাল। নিঃশব্দে নিজেকে

একটা গালি দিয়ে বেডরুমের দরজা খুলে ফেললেন তিনি।

তাঁর স্ত্রীর ভেজা মার্বেলের মত চোখ উল্টে আছে কপালের দিকে। ফুঁ দিয়ে মুখের উপরের চুল সরাল সে। চমৎকার বক্ষ জোড়া, যার আকর্ষণে এ মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলেন মি. ব্লিস. ঘামে ভেজা। পুরোটা ঘাম নিশ্চয় তার একার নয়।

মি. ব্লিস লোকটাকে চিনতে পাড়লেন না। কে ও? দুধঅলা? নাকি আদম শুমারির কেউ? লোকটা মোটাসোটা, লম্বা চুলে কাঁচি পড়ে না অনেক দিন।

খুবই হতাশ বোধ করলেন মি. ব্লিস। অসতী নারীর পরকীয়ার প্রেমিকরা সাধারণত সুদর্শন হয়ে থাকে। কিন্তু এ কাকে বেছে নিয়েছে তার স্ত্রী? রীতিমত অপমান বোধ হতে লাগল মি. ব্লিসের।

একটা ছুরি মেঝেতে ফেলে দিলেন তিনি, অন্যটা দু'হাতের মুঠোতে শক্ত করে ধরে কুমড়ো পটাশের ঘাড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন সজোরে।

কাজ হলো সঙ্গে সঙ্গে। লোকটা আরেকবার ঘোঁত করে উঠল, মোচড় খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে, ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্ত। মিসেস ব্লিস, হতভম্ব ও আতঙ্কিত, পা ও ডানা ছড়িয়ে নগ্ন অবস্থাতেই শুয়ে থাকল বিছানায়।

মি. ব্লিস দ্বিতীয় ছুরিটি তুলে নিলেন।

চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে স্ত্রীকে বিছানা থেকে টেনে নামালেন তিনি, ছুরি মারলেন মুখে। মুহূর্তে রক্তাক্ত হয়ে গেল চেহারা। পাগলের মত, তবে ভেবে চিন্তে, ধারাল ইস্পাতের ফলার আঘাত হানলেন তিনি যে সব জায়গায় তার স্ত্রী বেশি ব্যথা পাবে।

মি. ব্লিসের বেশির ভাগ এক্সপেরিমেন্টই সফল হয়েছে।

তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেল।

স্ত্রীর যন্ত্রণা, কান্না এবং শেষে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল মি. ব্লিসকে। বিয়ের রাত থেকে এ পর্যন্ত এরচে' বেশি রোমাঞ্চের স্বাদ তিনি পাননি কখনও। তবে মি. ব্লিসের রাগ তখনও পড়েনি। লাশটাকে কুপিয়েই চললেন তিনি ভোর রাত অবধি। তারপর ছুরি ফেলে দিয়ে কাপড় বদলে নিলেন।

মি. ব্লিস ভয়ানক নোংরা করে ফেলেছেন ঘর। ঘরদোর পরিষ্কারের কাজটা স্ত্রীর ভ্যাজর ভ্যাজরে বিরক্ত হয়ে বেশির ভাগ সময় মি. ব্লিসই করতেন। তিনি ছুরি মারতে গিয়ে ওয়াটার বেড ফুটো করে ফেলেছেন। তবে এতে একদিক থেকে ভালই হয়েছে। পানিতে বেশ খানিকটা রক্ত ধুয়ে গেছে।

মি. ব্লিস দু'জনকে ফুলের বাগানে আলাদা জায়গায় কবর দিলেন। তারপর আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করল না। ঢুকলেন একটা মোটেলে। টিভি দেখলেন। ছবি দেখাচ্ছে। এক লোক একের পর এক খুন করে চলেছে। তবে ছবির সমাপ্তি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারল না।

মি. ব্লিস তাঁর ঘরের দরজায় 'ডু নট ডিস্টার্ব' সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে রাখলেন। চান না কেউ তাঁকে বিরক্ত করুক। কিন্তু অফিস শেষে মোটেলের বিছানায় শোয়ার পর প্রতি রাতেই অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন তিনি। বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছে।

কয়েকদিন পরে অফিসে যেতে লজ্জা লাগল মি. ব্লিসের। এক কাপড়ে সে-ই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, এখনও ওটাই পরে আছেন। কাপড় থেকে দুর্গন্ধ আসছে। তিনি অধীর আগ্রহে সাপ্তাহিক ছুটির দিন দুটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ছুটির দিন দুটি মোটেল রুমে শান্তিতে কেটে গেল মি. ব্লিসের টিভি দেখে। কিন্তু রোববার রাতে মোজার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন এবার একবার তাঁকে বাড়ি যেতেই হবে। কিন্তু বাড়ি ফিরতে তাঁর মন সায় দিল না।

সদর দরজা খোলার সময় এ বাড়িতে শেষ বার পা রাখার কথা মনে পড়ে গেল। কেমন ছমছম করে উঠল গা। কিন্তু ওপরে তাঁকে যেতেই হবে। কিছু নতুন কাপড় না আনলেই নয়। বড় জোর কয়েক মিনিট লাগবে কাজটা সারতে। কোথায় কী রাখা আছে জানেন তিনি।

সামনের সিঁড়ি ব্যবহার করলেন মি. ব্লিস। কার্পেটে মোড়া বলে পায়ের শব্দ প্রায় হলোই না। তবু চোরের মত পা টিপে টিপে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন তিনি। ফুলের বাগানে যাদেরকে কবর দিয়েছেন মনে পড়ছে তাদের কথা। এবং ভাল লাগছে না।

আধাআধি সিঁড়ি বেয়েছেন মি. ব্লিস, দেয়ালে ঝোলানো গোলাপ ফুলের দুটি পেইন্টিংয়ে চোখ আটকে গেল। নামিয়ে রাখলেন ওগুলো। এ বাড়ি এখন শুধুই তাঁর। আর এ ছবি দুটো সবসময়ই বিরক্ত উৎপাদন করেছে মি. ব্লিসের। তবে ছবি শূন্য ফাঁকা দেয়ালও তাঁর ভেতরে অস্বস্তি জাগিয়ে তুলল।

পেইন্টিং জোড়া দিয়ে কী করবেন ভেবে না পেয়ে বেডরুমে নিয়ে এলেন। এ দুটোর হাত থেকে বুঝি রক্ষা নেই। অশুভ সংকেত মনে হচ্ছে চিত্রকলা দুটোকে। এগুলোকেও বাগানে, মাটির নীচে পুঁতে আসবেন কিনা এক মুহূর্তের জন্যে ভাবলেন মি. ব্লিস। চিন্তাটা হাসি এনে দিল, তবে হাসির শব্দটা নিজের কাছেই ভাল লাগল না। এসব নিয়ে আর হাসাহাসি করবেন না, সিদ্ধান্ত নিলেন।

বেডরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলালেন মি. ব্লিস। যাবার আগে ঘরটা ভালই পরিষ্কার করেছেন। তিনি একটি ড্রেসার ড্রয়ার মাত্র খুলেছেন, নীচে শব্দ হলো দুম্ করে। আন্ডারওয়্যার ড্রয়ারে স্থির হয়ে গেল চোখ।

এরপর খর্‌খর একটা আওয়াজ, তারপর পেছনের সিঁড়িতে দুড়ুম করে কিছু একটা আছড়ে পড়ল।

নীচে কী ঘটছে বুঝতে পারলেন না মি. ব্লিস। বন্ধ করে দিলেন আন্ডারওয়্যার ড্রয়ার, ঘুরলেন। বাম চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপল বার কয়েক। নিজের অজান্তে এগিয়ে গেলেন সামনের সিঁড়ির দিকে। ঠিক তখন নীচের দরজা খোলার শব্দ পেলেন। ছোট্ট একটা আওয়াজ, ছিটকিনি খুলে গেছে। হঠাৎ মাথাটা বোঁ করে উঠল মি. ব্লিসের।

তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন ওরা আসছে। আসছে তাঁকে ধরার জন্যে। দু'জনে দু'দিক থেকে। তিনি এখন কী করবেন? ঘরের মধ্যে দৌড়াতে লাগলেন মি. ব্লিস সেই সাথে দেয়ালে ঘুসি মেরে দেখছেন দেয়াল কতটা নিরেট। তারপর বিছানার পাশ থেকে একটা লাঠি তুলে নিলেন।

ওরা আসছে। মৃত জ্যান্ত হয়ে ফিরে আসছে তাঁকে শাস্তি দিতে। মি. ব্লিস দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। শিরদাঁড়া বেয়ে আতঙ্কের হিম স্রোত নামল দুটো দরজা খুলে যেতে।

আগন্তুক পেছনের সিঁড়ি ব্যবহার করেছে।

ওদেরকে কুপিয়ে কী দশা করেছেন, বিশেষ করে নিজের স্ত্রীকে, সে দৃশ্য ভুলে থাকতে চাইলেন মি. ব্লিস। ওদেরকে এখন আরও ভয়ঙ্কর লাগছে।

তাঁর স্ত্রী মেঝের উপরে শরীরটাকে টানতে টানতে নিয়ে

আসছে, রক্ত জমাট বেঁধেছিল যেখানটাতে সেখানকার মাংস বেগনি রঙ ধারণ করেছে, চামড়ায় লেগে আছে কাদামাটি। ওর গোসল দরকার, ভাবলেন তিনি, এবং আশ্চর্য, তাঁর হাসিও পেয়ে গেল এরকম অবস্থায়। হাসি থামাতে নাক দিয়ে বিদঘুটে আওয়াজ করলেন মি. ব্লিস।

স্ত্রীর প্রেমিক আসছে অন্য দিক থেকে। ছুরির আঘাতে প্রায় দ্বিখণ্ডিত ঘাড়ের উপর ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে মাথাটা। এরা আজ প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। তবে মি. ব্লিসও সহজে প্রাণ হারাতে রাজি নন। প্রয়োজনে লড়াই করবেন। তিনি ক্লজিট ডোরের দিকে পিছিয়ে গেলেন।

তাঁর স্ত্রী তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইল। কোটরের মধ্যে চোখ জোড়া বিবর্ণ ও কুঁচকে আছে। গায়ে যেখানে ছুরির আঘাত বেশি লেগেছিল, সেখান থেকে মাংস খসে পড়ছে।

তার প্রেমিক চার হাত পায়ে ভর করে এগোচ্ছে পেছনে কাদার চিহ্ন রেখে।

মি. ব্লিস খাট টেনে আনলেন সামনে ব্যারিকেড দিতে। তারপর ঢুকে পড়লেন ক্লজিটের মধ্যে। স্ত্রীর জামাকাপড় থেকে পারফিউমের গন্ধ নাকে ধাক্কা দিল। মি. ব্লিস সেঁধিয়ে গেলেন কাপড়চোপড়ের মধ্যে।

তাঁর স্ত্রী প্রথমে বিছানার কাছে পৌঁছুল, হাতে যে ক'টা আঙুল তখনও অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে চেপে ধরল বেডকভার। বিছানার উপরে নিজেকে টেনে তুলল সে। কাদা আর পচা রক্তে নোংরা হয়ে গেল চাদর। এবার ক্লজিট ডোর বন্ধ করা দরকার। কিন্তু ওরা কী করে দেখার কৌতূহলও হচ্ছে খুব। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলেন মি. ব্লিস।

স্ত্রী বালিশের ওপরে শুয়ে শরীর মোচড়াতে লাগল, হাত

ছুঁড়ছে শূন্যে। তারপর চিৎ হয়ে পড়ে রইল। বুদ্বুদ্ ওঠার মত শব্দ হলো। অবশেষে কি সত্যি মরেছে ও?

না।

তার প্রেমিক বালিশের গুজনির উপরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়ল। মি. ব্লিসের খুব ইচ্ছে করল বাথরুমে যেতে। কিন্তু যাবার রাস্তা বন্ধ।

তাঁর স্ত্রীর প্রেমিক (ওই বীভৎস জিন্দা লাশ!) হাতের মোটা মোটা আঙুলগুলো প্রসারিত করল। তবে মি. ব্লিসের দিকে প্রতিশোধের নেশায় ছুটে গেল না থাবা, বদলে তার শরীরের নীচে পড়ে থাকা শরীরের বুকে গিয়ে গাঁথল। তারপর দুটো শরীর নড়তে শুরু করল এক সাথে। চোখ ফিরিয়ে নিলেন মি. ব্লিস।

কাজটা শুরু হয়ে গেলে লজ্জায় লাল হয়ে গেল তাঁর গাল।

বিছানা থেকে ভেসে আসা শব্দ, তাঁকে আগের চেয়েও বেশি বিব্রত করে তুলল: দুই শরীরের তীব্র লড়াই, ভৌতিক গোঙানি, ও অতিপ্রাকৃত শীৎকার।

ক্লজিটের দরজা বন্ধ করে দিলেন মি. ব্লিস। বিছানায় নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত ওই দু'জন তাঁর দিকে ফিরেও তাকায়নি। নিজেকে সিল্ক আর পলেস্টারের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন মি. ব্লিস। ওখানে যা ঘটছে তা অসহ্য।

তিনি খামোকাই ভয় পেয়েছেন।

ওরা আদৌ তাঁর জন্য আসেনি।

ওরা এসেছে ওদের নিজেদের জন্য।

মূল: লেস ডেনিয়েলস-এর 'দে আর কামিং ফর ইউ।'

মিস্ট্রেস স্যারি

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরছি, লক্ষ করলাম দুটো বাচ্চা মেয়ে একটা বল নিয়ে উঠানে খেলতে খেলতে সুর করে গান গাইছে। গানের কথা কানে যেতে শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল, কেঁপে উঠলাম। আমি জানি এ গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক পা-ও এখান থেকে নড়তে পারব না। ওরা অতি পুরানো গানটা গাইছেঃ

'ওয়ান টু থ্রি অ্যালারি–
আই স্পাই মিস্ট্রেস স্যারি
সিটিং অন এ বাম্বল-অ্যারি,
জাস্ট লাইক এ লিটল ফেয়ারি!'

গান শেষ হওয়ার পরে আমি যেন জীবন ফিরে পেলাম। ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। চট করে লাগিয়ে দিলাম কপাট। বারান্দা, রান্নাঘর, লাইব্রেরি সব জায়গার আলো জ্বালালাম। তারপর অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম মেঝেতে। আস্তে আস্তে কমে এল উত্তেজনা। ফেলে আসা ভয়ঙ্কর স্মৃতিটির কথা মনে পড়ল। ওই গানের চরণ! আমি শিশুদের ঘৃণা করি না– আমার বন্ধুরা যা-ই বলুক, বাচ্চাদের আমি অপছন্দ করি না– কিন্তু ওদের ওই ভয়ানক গানটা গাইবার কী দরকার? বিশেষ করে

আমি যখন ওদের আশপাশে থাকি... যেন দুষ্টের শিরোমণিগুলো জানে গানটা গাইলে কী দশা হয় আমার...

ওয়েস্ট ইন্ডিজে বাপকে হারিয়ে মিসেস ক্লেটনের সঙ্গে থাকতে এসেছিল স্যারিয়েটা হন। তার মা মিসেস ক্লেটনের একমাত্র বোন, বাবা ব্রিটিশ উপনিবেশিক প্রশাসক, ওদের আর কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। কাজেই এটাই স্বাভাবিক যে বাচ্চাটাকে ক্যারিবিয়ান থেকে ন্যানভিলে, আমার বাড়িউলির কাছেই পাঠানো হবে। আর এটাও স্বাভাবিক তাকে ভর্তি করা হবে ন্যানভিল গ্রেড স্কুলে যেখানে আমি অঙ্ক শেখাই আর বিজ্ঞান পড়াই। আর মিস ড্রুরি ইংরেজি, ইতিহাস এবং ভূগোল পড়ান।

'ওই হন বাচ্চাটাকে নিয়ে আর পারি না!' মিস ড্রুরি একদিন সকালে ঝড়ের বেগে আমার ক্লাসরুমে ঢুকে পড়লেন। 'ও একটা উদ্ভট, বেয়াদব মেয়ে।'

মিস ড্রুরির উচ্চকিত কণ্ঠ শূন্য ক্লাসরুমে প্রতিধ্বনি তুলল। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস নেয়ায় তাঁর বিশাল বুক জোড়া ওঠানামা করছে। তিনি গটগট করে হেঁটে আমার ডেস্কের সামনে এলেন। আমি বুকে হাত বেঁধে হেলান দিলাম চেয়ারে।

'আপনার আরেকটু সতর্ক হওয়া দরকার। গত দু'হপ্তা নতুন একটা টার্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় স্যারিয়েটার খোঁজ-খবর নিতে পারিনি। মিসেস ক্লেটনের বাচ্চাকাচ্চা নেই। এজন্যই স্যারিয়েটাকে একটু বেশি স্নেহ করেন তিনি। আপনি জো রিচার্ডকে গত হপ্তায় যেভাবে মারপিট করেছেন, স্যারিয়েটার গায়ে হাত তুললে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় ক্ষুব্ধ হবেন– স্কুল বোর্ডও ব্যাপারটা মেনে নেবে না।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন মিস ড্রুরি। 'স্কুলে শিক্ষকতা

তো কমদিন হলো করছেন না। ভাল করেই জানেন জো রিচার্ডসের মত বাঁদরদের না পেটালে শায়েস্তা করা যায় না। এখনই ওর পিঠে বেত না ভাঙলে বড় হয়ে সে বাপের মতই মদ্যপ হবে।'

'ঠিক আছে। তবে মনে রাখবেন, স্কুল বোর্ডের অনেক সদস্যই আপনার ওপর নজর রাখছেন। আর স্যারিয়েটা হনের মধ্যে উদ্ভট কী দেখলেন? সে আলবিনো। পিগমেন্টেশনের অভাবে বংশগতভাবে অনেকেই এরকম হয় শুনেছি। তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করে বলেও জানি।'

'বংশগত!' প্রবল ঘৃণায় নাক কোঁচকালেন ভদ্রমহিলা। 'ও একটা ডাইনি। শয়তান ওকে সৃষ্টি করেছে। ক্লাসরুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ওর বাড়ি সম্পর্কে জানতে চাইলাম, সে উঠে দাঁড়িয়ে কিচকিচ করে বলল, "একমাত্র বোকারাই আমার বাড়ির খবর জানতে চায়।" তক্ষুনি ঘণ্টা না বেজে উঠলে ওকে আমি ঠিক পেটাতাম।' কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'ক্লাস নেয়ার সময় হয়ে গেছে। ঘণ্টাটা একবার চেক করে দেখবেন, মি. ক্লিন। আজ সকালে ওটা এক মিনিট আগে বেজেছে। আর, হন ছুকরিটাকে বেশি লাই দেবেন না।'

'এখানে কাউকেই বেশি লাই দেয়া হয় না।' মুচকি হাসলাম আমি। মিস ড্রুরি ঠকাশ করে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন।

একটু পরেই ক্লাসরুম ভরে গেল আট বছরের বাচ্চাদের কল-কাকলিতে।

শুরু করার আগে ক্লাসরুমে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। তাকালাম বেঞ্চির পেছনের সারির দিকে। ওখানে শক্ত হয়ে বসে আছে স্যারিয়েটা হন। হাতজোড়া ডেস্কের ওপর।

ক্লাসরুমের কালো আসবাবের মধ্যে মেয়েটার লম্বা, ছাইরঙা চুল আর ভয়াবহ রকমের সাদা ত্বক যেন হলদে একটা আভার সৃষ্টি করেছে। ওর চোখ সামান্য হলুদ, প্রায় স্বচ্ছ চোখের পাতার নীচে বর্ণহীন অক্ষিগোলক। ওকে একবারের জন্যও চোখের পাতা ফেলতে দেখলাম না।

মেয়েটা কুৎসিত। মুখটা অস্বাভাবিক বড়, কানজোড়া ছুঁচাল্ল হয়ে উঠে গেছে মাথার দিকে; নাকের ডগা অদ্ভুতভাবে বেঁকে ঝুলে আছে ওপরের ঠোঁটের গায়ে। রোগা-পাতলা গায়ে বরফ সাদা একটা ফ্রক চাপিয়েছে সে।

বাচ্চাদের অঙ্ক কষতে দিয়ে পেছনের বেঞ্চিতে একাকী মেয়েটার কাছে চলে এলাম আমি। 'আমার ডেস্কের কাছে এসে বসো,' নরম গলায় বললাম। 'তা হলে ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার দেখতে পাবে।'

সিধে হলো স্যারিয়েটা। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, সার। ক্লাসরুমের সামনে রোদ পড়ে। আমার চোখে লাগে। আমি রোদ সহ্য করতে পারি না। তাই অন্ধকারে বসতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। মেয়েটার নিখুঁত শব্দচয়ন চমকে দিয়েছে আমাকে।

বিজ্ঞানের ক্লাস নেয়ার সময় টের পেলাম আমাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করছে স্যারিয়েটা। আমার ভারী অস্বস্তি হতে লাগল। পলকহীন একজোড়া চোখ সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে আমার দিকে, অস্বস্তি তো লাগবেই। বাচ্চারাও বোধহয় টের পেয়ে গেছে ব্যাপারটা। ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে, সারসের মত গলা বাড়িয়ে পেছনের বেঞ্চিতে তাকাচ্ছে।

প্রজাপতির একটা জার ডেস্ক খুলে নিতে গিয়ে হাত ফস্কে

ওটা পড়ে গেল। আমি ওটা ঝুঁকে তুলতে গেছি, হঠাৎ হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ বেরুল একযোগে ত্রিশটি কচি কণ্ঠ থেকে।

'ওই দ্যাখো! ও আবার ওটা করছে!' আমি সিধে হলাম।

স্যারিয়েটা হন নিজের জায়গায় আগের মতই পাথর হয়ে বসে আছে। তবে ওর চেহারায় পরিবর্তন ঘটেছে। চুলের রঙ হয়ে গেছে গাঢ় তামাটে; চোখ নীল; গাল আর ঠোঁটে গোলাপি ছোপ।

ডেস্কের কিনারা চেপে ধরলাম আমি হাত দিয়ে। অসম্ভব! আলো-ছায়া এরকম কিছু তৈরি করতে পারে? উঁহুঁ–এ সম্ভব নয়!

আমি অন্যদের সঙ্গে স্যারিয়েটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে মনে হলো লজ্জা পেল মেয়েটা। জোর করে ওর উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শূককীট নিয়ে কাঁপা গলায় বক্তৃতা শুরু করলাম। একমুহূর্ত পরে আবার নজর চলে গেল স্যারিয়েটার দিকে। ওর মুখ আর চুল সাদা ধবধব করছে। ক্লাস নেয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেল।

'ও আমার ক্লাসেও ঠিক একই কাণ্ড করেছে,' লাঞ্চের সময় বললেন মিস ড্রুরি। 'তখন সে চুল আর চোখের রঙ কালো করে ফেলেছিল। এরপর ও আমাকে বোকা বলে ঠাট্টা করে। আমি বেতের দিকে হাত বাড়িয়েছি, মনে হলো ওর শরীর কুচকুচে কালো হয়ে গেছে। তবে ওকে পিটিয়ে লাল বানানোর ইচ্ছে ছিল যদি না ওই মুহূর্তে ঘণ্টা বেজে উঠত।'

'আপনি হয়তো চোখে ভুল দেখেছেন,' বললাম আমি।

'আমিও জানি না ঠিক কী দেখেছি। তবে স্যারিয়েটা হন গিরগিটি নয় যে এভাবে রঙ বদলাবে।'

বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে কিছুক্ষণ শক্ত

করে চেপে ধরে থাকলেন। তার বলিরেখায় ঢাকা মুখে ম্লান, রক্তশূন্য লাগল ঠোঁট। মাথা নাড়লেন তিনি, ঝুঁকে এলেন টেবিলের দিকে। 'ও গিরগিটি না। তবে ও একটা ডাইনি এ আমি হলফ করে বলতে পারি। বাইবেলে ডাইনিদের ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়া আছে। তাদেরকে পুড়িয়ে মারার কথা বলেছে।'

আমার হাসি নোংরা বেযমেন্টে, যেটাকে আমরা লাঞ্চরুম হিসেবে ব্যবহার করি, প্রতিধ্বনি তুলল। 'কী যা তা বলছেন! আট বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে–'

'ও বড় হয়ে মস্ত কোনও ক্ষতি করার আগেই ওকে থামানো দরকার। আমি আপনাকে বলছি, মিস্টার ফ্লিন, আমি জানি স্যারিয়েটা একটা ডাইনি। আমার পূর্বপুরুষরা নিউ ইংল্যান্ডে বিচারের সময় ত্রিশটা ডাইনি পুড়িয়ে মেরেছেন। আমাদের পরিবার ডাইনি দেখলেই বুঝতে পারে। ওদের সঙ্গে আমাদের কোনও সখ্য নেই!'

মিস ড্রুরির সঙ্গে অন্য বাচ্চারা কীভাবে যেন মিলে গেল। তারা আলবিনো বাচ্চাটাকে 'মিস্ট্রেস স্যারি' বলে ডাকতে লাগল। তবে জোয়ি রিচার্ডস এ দলে ভিড়ল না। বরং স্যারিয়েটা বাড়ি যাবার সময় অন্য মেয়েরা 'মিস্ট্রেস স্যারি' বলে সুর করে গাইতে গাইতে তার পিছু নিলে জোয়ি তাদেরকে ধমক দিল। স্যারিয়েটা বাধা দিল জোয়িকে।

'ওদেরকে কিছু বোলো না, জোসেফ,' বড়দের গলায় জোয়িকে বলল সে। 'ওরা ঠিকই বলছে। আমি তো খুদে ডাইনিই।'

জোয়ি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল স্যারিয়েটার দিকে। বাচ্চাদের ঘুসি মারার জন্য হাত তুলেছিল। আপনাআপনি নেমে

এল হাত। কোনও কথা না বলে ধীর পায়ে স্যারিয়েটার পাশে হাঁটতে থাকল। স্যারিয়েটাকে সে রীতিমত ভক্তি করে। হতে পারে শিশু মহলে ওরা দু'জন সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে স্যারিয়েটার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগেনি। এ হওয়াও বিচিত্র নয় যে দু'জনেই এতিম—জোয়ির বাপটা আস্ত একটা বদমাশ। এরকম বাপ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। স্যারিয়েটা আর সে সবসময় একসঙ্গে থাকে। আমি বোর্ডিং হাউজের বারান্দায় খোলা হাওয়া খেতে বেরিয়ে এসে দেখেছি জোয়ি সাঁঝের আলোয় স্যারিয়েটার পায়ের কাছে বসে আছে অনুগত ভৃত্যের মত। আমাকে দেখে ওদের কথা থেমে গেছে। ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে চুপ হয়ে থাকতে বলেছে জোয়িকে। আমি বারান্দা থেকে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে থেকেছে দু'জনেই।

জোয়ি আমাকে খানিক পছন্দ করে। ফলে মিস্ট্রেস স্যারির গল্প শোনার মওকা মিলল ওর কাছ থেকে। একদিন সন্ধ্যায় হাঁটাহাঁটি করতে বেরিয়েছি, দেখি পেছন পেছন আসছে জোয়ি।

'ইস্,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'স্টোগোলো মিস্ট্রেস স্যারিকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। বুড়ি ড্রুরিকে যদি সে একটা উচিত শিক্ষা দিতে পারত বেশ হত। তবে শিক্ষা সে একদিন পাবে। অবশ্যই পাবে।'

'স্টোগোলো কে?'

'সে ডাইনি-জাদুকর। সে স্যারির মাকে অভিশাপ দিয়েছিল স্যারির জন্মের আগে। কারণ তাকে স্যারির মা জেলে ঢুকিয়েছিল। স্যারির মা সন্তান জন্ম দেয়ার সময় মারা গেলে স্যারির বাবা মদ খেতে শুরু করেন। স্যারি বলেছে আমার বাবার চেয়েও নাকি সে খারাপ। স্যারির সঙ্গে স্টোগোলোর

দেখা হয়ে যায়। স্যারি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। জাদুকর স্যারিকে ভুডুবিদ্যা শিখিয়েছে। বলেছে কীভাবে অভিশাপ দিলে তা ফলে যায়। ওরা আঙুল কেটে একে অন্যের গায়ে রক্ত মাখিয়ে দেয়। স্যারি'র মার কবরে গিয়ে শান্তির জন্য প্রার্থনাও করেছে। স্টোগোলো স্যারিকে কীভাবে কাউকে বশ করা যায় সে মন্ত্রও শিখিয়েছে। শুয়োরের লিভার আর—

'তোমার কথা শুনে আমার অবাক লাগছে, জোয়ি,' মাঝপথে বাধা দিলাম আমি। 'তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করো? মিস্ট্রেস স্যারি—স্যারিয়েটা জন্মেছে প্রাচীন একটা পরিবারে, যেখানকার লোকজন বাইরের দুনিয়ার কোন খবর রাখে না। কিন্তু তুমি তো রাখো!'

রাস্তার পাশের ঝোপের মধ্যে পা টেনে টেনে চলছে জোয়ি, মৃদু গলায় বলল, 'জ্বী, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে মিস্ট্রেস স্যারির কথা বলার জন্য আমি দুঃখিত, মি. ফ্লিন।'

তারপর ও চলে গেল। ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে। কথার মধ্যে বাধা দেয়ার জন্য পরে আমার আফসোস হয়েছে। ভেবেছি কেন আমি জোয়িকে আরও কথা বলতে দিলাম না। কেন স্যারিয়েটা সম্পর্কে আরও খোঁজ-খবর নিলাম না। তা হলে হয়তো পরবর্তীতে ওই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটত না।

গরম পড়েছে। তাপমাত্রা দিন দিন হুহু করে বেড়ে চলেছে। একদিন সকালে মিস ড্রুরি আমাকে বললেন, 'আমি আমার জীবনেও এমন শীতকাল দেখিনি। শীতের সময়েও এত গরম!'

'বিজ্ঞানীরা বলছেন পৃথিবীর আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। তবে এবারের গরমটা একটু অস্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। উপসাগরীয় স্রোত—'

'উপসাগরীয় স্রোত!' মুখ বাঁকালেন মিস ড্রুরি। এই গরমের দিনেও তিনি গায়ে ভারী জোব্বাজোব্বি চাপিয়েছেন। 'উপসাগরীয় স্রোত না ছাই? ওই হন হারামজাদী ন্যানভিলে আসার পর থেকে উল্টোপাল্টা সব ঘটনা ঘটছে। লেখার সময় আমার চক সবসময় ভেঙে যাচ্ছে, ডেস্কের ড্রয়ার টেনেও খুলতে পারছি না, ইরেজার পড়ে যায় হাত দিয়ে—ডাইনিটা আমাকে জাদু করার চেষ্টা করছে!'

'দেখুন,' আমি সিধে হয়ে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। 'এ নিয়ে অনেক হয়েছে। আপনি ডাকিনি বিদ্যায় বিশ্বাস করলে করুন। এর মধ্যে বাচ্চাদেরকে জড়াতে যাবেন না। ওরা এখানে আসে পড়াশোনা করতে, উদ্ভট কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে নয়।'

'বেশ, বলে যান!' ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন মহিলা। 'আমি জানি আপনি আমাকে নিয়ে কী ভাবছেন, মি. ফ্লিন। আপনি মেয়েটাকে লাই দেন বলে সে আপনাকে কিচ্ছু বলে না। কিন্তু আমি জানি ও কতবড় ডাইনি। ওর সঙ্গে আমার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। শুভ-অশুভের লড়াই। একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এ লড়াই শেষ হবে না!' স্কার্টে ঘূর্ণি তুলে তিনি গটগট করে স্কুলের দিকে পা বাড়ালেন।

মহিলা উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে কিনা ভাবলাম আমি। ভয়ও লাগল। তবে আসল ভয়ের তখনও দেরি ছিল।

সেদিন অঙ্কের ক্লাস ছিল। বাচ্চাগুলোকে দেখলাম চুপচাপ। ক্লাসরুমের দরজা বন্ধ করে ডেস্কের দিকে এগিয়েছি, ফিসফাস শুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে। 'স্যারিয়েটা হন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'আর জোয়ি রিচার্ডস।' ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না ক্লাসে।

লুইজি বেল বেঞ্চি ছেড়ে উঠল। 'ওরা দুষ্টুমি করছিল বলে মিস ড্রুরি ওদেরকে আটকে রেখেছেন। জোয়ি মিস ড্রুরির এক গোছা চুল কেটে ফেলে। মিস ড্রুরি ওকে ধরে বেত দিয়ে পেটাতে থাকেন। মিস্ট্রেস স্যারি তখন জোয়ির গায়ে হাত দিতে নিষেধ করে টিচারকে। বলে জোয়ি নাকি তার প্রটেকশনে আছে। মিস ড্রুরি ভয়ানক রেগে গিয়ে আমাদের সবাইকে ক্লাস রুম থেকে বের করে দিয়েছেন। সম্ভবত এখন ওদেরকে ধরে পেটাচ্ছেন তিনি,' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগল লুইজি।

আমি দ্রুত খিড়কির দরজার দিকে পা বাড়ালাম। এমন সময় তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনলাম। স্যারিয়েটার কণ্ঠ! দ্রুত ছুটলাম করিডর ধরে। চিৎকারটা এক সেকেন্ডের জন্য তীব্র নিনাদে পরিণত হলো। তারপর থেমে গেল।

মিস ড্রুরির ক্লাসরুমের দরজা খুলে ফেললাম এক ঝটকায়। আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম, এমনকী হত্যাকাণ্ড দেখব বলেও মানসিক প্রস্তুতি ছিল আমার। তবে যা দেখলাম তার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। দরজার হাতল চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

জোয়ি রিচার্ডস ব্ল্যাকবোর্ডের ধার ঘেঁষে দাঁড়ানো। ঘামে ভেজা ডান হাতে এক গোছা বাদামী রঙের চুল। মিস্ট্রেস স্যারি মিস ড্রুরির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। তার ঘাড়ে লাল দগদগে একটা দাগ। মিস ড্রুরি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন হাতে ধরা বেতের দিকে। বেতটা ভাঙা; ভাঙা বাকি অংশটা পড়ে আছে তাঁর পায়ের তলায়।

আমাকে দেখে যেন জীবন ফিরে পেল বাচ্চা দুটো। মিস্ট্রেস

স্যারি সিধে হলো, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে পা বাড়াল দরজার দিকে। জোয়ি রিচার্ডসও সামনে বাড়ল। চুলের গোছা ঘষে দিল মিস ড্রুরির জামায়। কিন্তু মহিলা ব্যাপারটা খেয়ালই করলেন না। হতভম্ব হয়ে এখনও ভাঙা বেতটা দেখছেন। ছেলেটা দোরগোড়ায় দাঁড়ানো মেয়েটার সঙ্গে যোগ দিল। আমি পরিষ্কার দেখলাম ওর মুঠোর চুল চকচক করছে। মিস ড্রুরির শরীরের ঘামে ভেজা।

মিস্ট্রেস স্যারি মৃদু মাথা ঝাঁকাল, জোয়ি চুলের গোছা তার হাতে দিল। মেয়েটা সাবধানে ওটা রেখে দিল ফ্রকের পকেটে।

তারপর কোনও কথা না বলে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ক্লাসের দিকে।

আমি মিস ড্রুরির কাছে গেলাম। থরথর করে কাঁপছেন তিনি। আপন মনে কথা বলছেন। চোখ ফেরাতে পারছেন না ভাঙা বেত থেকে।

'ভেঙে গেল! আপনাআপনি বেতটা ভেঙে গেল!' মিস ড্রুরিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম আমি। তিনি বিড়বিড় করেই যেতে লাগলেন।

'একবার–মাত্র একবার আমি মেয়েটাকে মেরেছি। আরেকবার মারার জন্য মাত্র হাত তুলেছি–ঠাশ্ করে বেতটা ভেঙে গেল। জোয়ি ব্ল্যাকবোর্ডের ধারে ছিল। ও বেতে হাত দেয়নি। বেতটা আপনাআপনি ভেঙে গেছে!' তিনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ভাঙা বেতের দিকে তাকিয়ে থাকলেন; শরীরটা সামনে পেছনে দোল খাচ্ছে, যেন বিরাট একটা ক্ষতির জন্য শোক করছেন।

আমার ক্লাস ছিল। মিস ড্রুরিকে এক গ্লাস পানি খেতে দিলাম। দারোয়ানকে বললাম তাঁর ওপর খেয়াল রাখতে।

তারপর তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

আমার ঘরের ব্ল্যাকবোর্ডে কাঁচা হাতে, বড় বড় অক্ষরে কেউ অর্থহীন একটা ছড়া লিখে গেছে:

ওয়ান টু থ্রি অ্যালারি–
আই স্পাই মিস্ট্রেস স্যারি
সিটিং অন এ বাম্বল-অ্যারি
জাস্ট লাইক এ লিটল ফেয়ারি

রাগ হলো খুব। ঢুকলাম ক্লাসে। দেখলাম জোয়ি রিচার্ডসের ডেস্ক শূন্য। সে ঘরের শেষ মাথায় অন্ধকার কোণটাতে বসেছে মিস্ট্রেস স্যারির সঙ্গে।

মিস্ট্রেস স্যারি সকালের ঘটনাটা তার খালার কাছে বলল না দেখে স্বস্তি পেলাম। সাপার টেবিলে বরাবরের মত নীরব থাকল সে, প্লেটের ওপর সেঁটে রইল চোখ। খাওয়া শেষ হতে চলে গেল। মিসেস ক্লেটন যথারীতি বকবক করতে লাগলেন।

খাওয়া শেষে মিস ড্রুরির বাড়ির উদ্দেশে হাঁটা দিলাম। তিনি প্রাচীন আদলের পুরানো একটা বাড়িতে তার এক আত্মীয়ের সঙ্গে থাকেন। এটুকু পথ আসতে ঘেমে নেয়ে গেলাম। ভয়ানক গরম পড়েছে। এক ফোঁটা বাতাস নেই। গাছের পাতাগুলো স্থির।

বৃদ্ধা আগের চেয়ে ভাল আছেন। তবে ব্যাপারটা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। আমি স্যারিয়েটার সঙ্গে শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দিলাম। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন। 'অসম্ভব ব্যাপার! ওই অন্ধকারের ভূতটার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করতে পারব না। ও আমাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। করবেই তো, কারণ ওর আসল পরিচয় যে ফাঁস করে দিয়েছি আমি। সবাইকে জানিয়ে

দিয়েছি ও একটা ডাইনি। এবার ওর সঙ্গে আমার সংঘর্ষ অবধারিত। ওকে আর ওর গুরুটাকে আমার ধ্বংস করতেই হবে। কিন্তু–কিন্তু আমার মাথায় কিছুই খেলছে না। প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে পড়েছি।' ভারী কাশ্মীরী শাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি।

আমি চলে এলাম ওখান থেকে। এ নিয়ে একটা ঝামেলা হবে বুঝতে পারছি। স্কুল কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত চালাবেন। তারপর আমাদের কপালে কী আছে কে জানে। আমি এ সমস্যার একটা সমাধান নিয়ে ভাবতে চাইলাম। কিন্তু তীব্র গরমে আমার অবস্থাও কাহিল। গায়ের সঙ্গে ঘামে ভিজে এঁটে রয়েছে পোশাক।

স্কুল বারান্দাটা খালি। বাগানে একটা নড়াচড়া লক্ষ করে ওদিকে পা বাড়ালাম দ্রুত। দু'জন মানুষ। মিস্ট্রেস স্যারি এবং জোয়ি। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওরা।

মাটিতে উবু হয়ে বসেছে মিস্ট্রেস স্যারি। হাতে একটা পুতুল। মোমের পুতুল। মাথায় বাদামী চুল। মিস ড্রুরির চুলের মত। মিস ড্রুরির পোশাকের মত একটা স্কার্ট পরানো হয়েছে পুতুলটাকে। নোংরা এক টুকরো মসলিনের কাপড় দিয়ে বানানো হয়েছে স্কার্ট। মিস ড্রুরিও মসলিনের স্কার্ট পরেন। পুতুলের চেহারাও অনেকটা বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর মত।

'তোমরা কী পাগলামি শুরু করেছ বলো তো,' অবশেষে রা ফুটল আমার গলায়। 'মিস ড্রুরি তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে এখন নিজেই মনোকষ্টে ভুগছেন। তোমরা চাইলে আমরা সবাই তোমাদের বন্ধু হতে পারি।'

সিধে হলো ওরা। স্যারিয়েটা পুতুলটাকে বুকে চেপে রেখেছে। 'এটা পাগলামি নয়, মি. ফ্লিন। ওই খারাপ মহিলার

একটা শিক্ষা হওয়া দরকার। এমন শিক্ষা যা জীবনেও সে ভুলবে না। মাফ করবেন, সার। আমি আসি। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।'

চলে গেল স্যারিয়েটা। সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরে। আমি ছেলেটার দিকে ফিরলাম।

'জোয়ি, তুমি তো খুব বুদ্ধিমান ছেলে। তুমি–'

'মাফ করবেন, মি. ফ্লিন,' সে পা বাড়াল গেটের দিকে। 'আ-আমি বাড়ি যাব।' ফুটপাতে ওর জুতোর শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল।

সে রাতে আমার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটল। সারারাত এপাশ ওপাশ করে কাটালাম। ঝিমোলাম, ঘুম এল, আবার দুঃস্বপ্ন দেখে ভেঙে গেল।

গভীর রাতে হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে ভেঙে গেল ঘুম। কেউ মিহি গলায় গান গাইছে। খাড়া করলাম কান। স্যারিয়েটার কণ্ঠ!

গান গাইছে ও। তবে দুর্বোধ্য এক ভাষায়। ক্রমে চওড়া আর দ্রুত হয়ে উঠল সুর। ভয়ঙ্কর কিছু একটার সঙ্গে যেন মিলিত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে মেয়েটা গানের সুরে। তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠল গলা। তারপর বিরতি দিল। একমুহূর্ত পর কান ফাটানো সুরে চিৎকার করে উঠল স্যারিয়েটা, 'কুরুনো ওও স্টোগোলো ওওও।' তারপর সব চুপ।

ঘণ্টা দুই পরে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

চোখে রোদের জ্বালা নিয়ে ঘুম ভাঙল আমার। শরীর কেমন ক্লান্ত লাগছে। খিদেও নেই। জীবনে এই প্রথম সকালের নাস্তা না করে ঘর থেকে বেরুলাম।

ফুটপাত থেকে উত্তাপ উঠে আসছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে মুখের

চামড়া আর হাত। জুতোর সুখতলা ভেদ করে কড়া উত্তাপ ঢুকছে। জ্বালা করছে পা। স্কুলঘরের ছায়ায় দাঁড়িয়েও স্বস্তি লাগল না একটুও।

মিস ড্রুরিরও খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। বেযমেন্টের টেবিলে লেটুস পাতায় মোড়ানো তার স্যান্ডউইচ অভুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। হাতের ওপর মাথা রেখে লাল টকটকে চোখ মেলে তিনি তাকালেন আমার দিকে।

'উহ্, কী গরম!' ফিসফিস করলেন তিনি। 'আর সইতে পারি না। হন হারামজাদীর জন্যে সবার এত দরদ কেন বুঝি না। ওটাকে রোদের মধ্যে বসিয়ে রেখেছি শুধু। ও আর কী কষ্ট পাচ্ছে। ওর চেয়ে হাজারগুণ ভুগছি আমি।'

'আপনি...স্যারিয়েটাকে...রোদের মধ্যে...'

'হ্যাঁ, রোদের মধ্যে বসিয়ে রেখেছি। তাতে কী হয়েছে? সারাক্ষণ ক্লাসের কোনায়, অন্ধকারে বসে থাকে। বড় জানালাটার পাশে ওকে বসিয়ে দিয়েছি যাতে গায়ে রোদ লাগে। গরম কাকে বলে এখন টের পাচ্ছে শয়তানিটা। তবে ওর চেয়ে অনেক বেশি গরমে হাঁসফাঁস করছি আমি। কাল সারারাত এক মুহূর্তের জন্যেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ঘুমালেই ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি। দেখেছি বিরাট বিরাট দুটো হাত আমাকে ধরে মোচড়াচ্ছে, ছুরি দিয়ে খোঁচা মারছে আমার মুখে এবং হাতে—'

'কিন্তু মেয়েটা রোদ সইতে পারে না! ও আলবিনো।'

'আলবিনো? দুরো, ও একটা ডাইনি। এরপর ও মোমের পুতুল বানাবে। জোয়ি রিচার্ডস শুধু শুধু আমার চুল কেটে নেয়নি। ওকে হুকুম দেয়া হয়েছিল—ওওহ্!' আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। 'আমার হাত-পায়ে খিল ধরে গেছে গো!'

আমি বললাম, 'মোমের পুতুলের কথা বলে ভালই করেছেন। মেয়েটাকে আপনি ডাইনি ডাইনি বলতে তার মনেও ধারণা জন্মেছে সে একটা ডাইনি। সে এখন মোমের পুতুল বানাতে শুরু করেছে। কাল রাতে আপনার বাসা থেকে যাওয়ার পরে—' ঝট করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন মিস ড্রুরি। বিস্ফারিত দৃষ্টি চোখে। 'ও আমার মোমের পুতুল বানিয়েছে?'

'হ্যাঁ। অনেকটা আপনার মত চেহারা। ওর প্রতিভা আছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমার।'

আমার কথা কানে ঢুকছে না মিস ড্রুরির। 'হাত-পায়ের খিল!' বিড়বিড় করছেন তিনি। 'আমি ভেবেছি হাতপায়ে খিল ধরেছে তাই গায়ে ব্যথা হচ্ছে। আসলে ডাইনিটা আমার গায়ে পিন ফোটাচ্ছে। হারামজাদী—ওকে আমি—না, আমাকে সাবধানে কাজ করতে হবে। তবে খুব দ্রুত। হাতে সময় নেই একদম।'

আমি বৃদ্ধার কাঁধে হাত রাখলাম। 'একটু শান্ত হোন তো! কীসব আবোলতাবোল বকছেন?'

এক লাফে সরে গেলেন তিনি, ছুটলেন সিঁড়ির দিকে। আপনমনে বকবক করে চলেছেন। 'বেত বা লাঠি দিয়ে কাজ হবে না। ওগুলো ও ভেঙে ফেলবে। ওর গলা টিপে ধরব। শ্বাস রোধ করে মারব। আমাকে ও ঠেকাতে পারবে না। সে সুযোগ ওকে দেব না।' প্রায় হেঁচকি উঠে গেল মিস ড্রুরির। 'ওকে কোনওভাবেই সুযোগ দেয়া যাবে না।'

ঝড়ের বেগে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন তিনি। আমিও ছুটলাম তাঁর পেছন পেছন।

স্কুলের উঠোনের শেষ মাথায় লম্বা কাঠের বেড়ার ধারে বাচ্চারা দুপুরের খাবার খাচ্ছিল। কিন্তু খাওয়া থেমে গেছে তাদের।

সবার চোখে বিস্ময় মেশানো ভয়। তাদের খোলা মুখে স্যান্ডউইচ। ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম আমি।

মিস ড্রুরি ভবনের পাশ দিয়ে খাড়া ভঙ্গিতে হেঁটে আসছেন। দেয়াল ধরে হাঁটছেন তিনি, মাঝে মাঝেই টলে উঠছেন। তার দুই হাত সামনে, ছায়ায় বসে আছে স্যারিয়েটা হন আর জোয়ি রিচার্ডস। ওরা রোদে, সিমেন্টের ওপর রাখা মসলিন কাপড় পরা একটা মোমের পুতুলের দিকে তাকিয়ে আছে আগ্রহ নিয়ে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে পুতুলটা। কড়া রোদ পড়েছে গায়ে। দূর থেকেও বুঝতে পারলাম রোদের তেজে গলে যাচ্ছে ওটা।

'অ্যাই?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'মিস ড্রুরি! কী করছ তোমরা!'

আমার গলা শুনে বিস্মিত হয়ে তাকাল দু'জনেই। মিস ড্রুরি দেয়ালের অবলম্বন ছেড়ে দিলেন, টলে উঠলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাচ্চা মেয়েটার গায়ে। খপ্ করে পুতুলটা মুঠোয় পুরে নিল জোয়ি। ছুটে এল আমার দিকে। মুখোমুখি ধাক্কা লাগল দু'জনের। দু'জনেই ছিটকে পড়লাম মাটিতে। পড়ার আগ মুহূর্তে দেখলাম মিস ড্রুরি ডান হাতে চেপে ধরেছেন স্যারিয়েটার গলা। বাচ্চাটার ছোট্ট শরীর ঢাকা পড়েছে বৃদ্ধার বিশাল দেহের নীচে।

আমি উঠে বসলাম। এমন সময় বাচ্চারা এমন ভয়ার্ত চিৎকার ছাড়ল, গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল আমার।

জোয়ি দু'হাতে পুতুলটাকে মোচড়াচ্ছে। আমি পুতুলটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছি না। রোদের তেজে আগেই অনেকটা গলে গিয়েছিল পুতুল, চেহারাও গেছে বিকৃত হয়ে। জোয়ির আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে পড়ছে গলা মোম।

বাচ্চাদের চিৎকার ছাড়িয়ে মরণভেদী আর্তনাদ করে উঠলেন মিস ড্রুরি। আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে চিৎকার করেই যেতে লাগলেন।

জোয়ি আমার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল মহিলার দিকে। পুতুলটাকে হাতের মধ্যে মুচড়ে চলেছে সে। আমি নড়াচড়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি। হাঁ করে তাকিয়ে আছি জোয়ির হাতের দিকে। জোয়ি হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় গান ধরল। ক্রমে চড়া হয়ে উঠল সুর, মিস ড্রুরির যন্ত্রণাকাতর চিৎকার ঢাকা পড়ে গেল গানের তীব্রতায়:

ওয়ান টু থ্রি অ্যালারি–
আই স্পাই মিস্ট্রেস স্যারি
সিটিং অন এ বাম্বল-অ্যারি
জাস্ট লাইক এ লিটল ফেয়ারি

মিস ড্রুরি একের পর এক আর্তনাদ করে চলেছেন, ভয়ে চেঁচাচ্ছে বাচ্চারা, জোয়ি গান গাইছে। কিন্তু আমার চোখ ছোট্ট, মোমের পুতুলটার দিকে। দেখছি জোয়ির ছোট্ট, শক্ত আঙুলের চাপে কীভাবে ওটা দুমড়েমুচড়ে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। আমি শুধু পুতলটাকে দেখছি...

মূল: উইলিয়াম টেন-এর মিস্ট্রেস স্যারি।

প্রতিবিম্ব

দানব বৈদ্যুতিক মাকড়সার চেহারা নিয়ে কুৎসিত, আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের রেখা চিরে দিল রাতের অন্ধকার আকাশ। কান ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল দূরে কোথাও। ঝমঝমিয়ে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি।

পঞ্চদশী ক্যারল জেন ইলেরি মাথার উপর একটা খবরের কাগজ রেখে দ্রুত পা চালাল বাড়ির দিকে। বৃষ্টিতে ইতিমধ্যে ভিজে গেছে জুতো। বাড়ির সদর দরজার সামনে চলে এল ক্যারল। ঠাণ্ডা লেগে গেছে ওর। কাঁপছে ঠকঠক করে। দরজার ম্যাটের নীচে হাত ঢুকিয়ে অতিরিক্ত চাবিটা খুঁজল।

'ধ্যাত্তেরি!' চাবি না পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল ক্যারল। ফুলের টবগুলোর নীচে আঙুল ঢোকাল, দরজার মাথায়, কিছুই ঠেকল না হাতে।

বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। তবু ঝুঁকিটা নিল ক্যারল। দ্রুত পা চালিয়ে চলে এল বাড়ির পেছনে। খিড়কির দরজার নব-এর দিকে হাত বাড়াল না। লাভ হবে না। বন্ধ দরজা। কী করতে হবে জানে ক্যারল। বাবা-মা রেগে আগুন হয়ে যাবেন, মনে মনে বলল ও। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া হয়ে যাবে আমার।

সমস্যার সমাধানে সে এক পাটি জুতো খুলে ফেলল পা থেকে। জুতোর তীক্ষ্ণ হিল দিয়ে বাড়ি মারল রান্নাঘরের জানালায়। কিছুই ঘটল না। দ্বিতীয়বারে আরও জোরে বাড়ি দিল ক্যারল। ঝনঝন শব্দে ভাঙল জানালা, খুরের মত ধারাল টুকরোগুলো ছিটকে পড়ল ভেতরে, ছড়িয়ে গেল রান্নাঘরের চারপাশে।

প্রতিবেশীরা জানালা ভাঙার শব্দ শুনতে পেয়েছে কিনা জানে না ক্যারল। দুশ্চিন্তা বোধ করল ও। সদ্য তৈরি ফাঁকে হাত বাড়াল, কিচেন কাউন্টারের উপর ছিটিয়ে থাকা কাঁচের টুকরোগুলো যতটা পারল পরিষ্কার করল। তারপর নিজেকে টেনে তুলল ও, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল জানালার ফাঁকে। রান্নাঘরের আলমারির উপর থেকে নামছে ক্যারল, কাঁচের টুকরো বিঁধে গেল কব্জিতে। প্রায় একই সময়ে পাতলা সোলের জুতো ভেদ করে একখণ্ড কাঁচ ঢুকে গেল পায়ের পাতায়। ব্যথায় কুঁচকে গেল ক্যারলের মুখ। ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে বেরুতে লাগল রক্ত। ভাঙা জানালা থেকে রান্নাঘরের মেঝে পর্যন্ত রক্তের লম্বা একটা রেখা তৈরি হলো। বাতির সুইচেও লেগে গেল রক্ত।

'বাহ্, দারুণ!' কিচেনের সিঙ্কে রক্তমাখা হাত ধুতে ধুতে গুঙিয়ে উঠল ক্যারল। 'বাবা-মা আমাকে ঠিক খুন করে ফেলবে!'

কাবার্ডের নীচের রোলার থেকে আধ ডজন পেপার টাওয়েল টেনে নিল ক্যারল, পা এবং কব্জির রক্ত মুছল। রান্নাঘরের মেঝে মোছার চেষ্টা করল খামোকাই, তারপর দ্রুত চলে এল গেস্ট বাথরুমে। আসমানি রঙের বাথ টাওয়েলে আবার মুছল রক্ত। অনেকটা রক্ত বেরোলেও ক্ষত তেমন গভীর নয়। দ্রুত ব্যান্ডেজ করে নিল ক্যারল।

এবারে একটু ভাল লাগছে ওর, চলে এল হলঘরে। সিঁড়ির

মাথায় আলো জ্বলছে দেখে অবাক হলো ক্যারল। বাবা-মা বাড়ি আছে নাকি? নিশ্চয় জানালা ভাঙার শব্দ ওদের কানে গেছে।

'কেউ বাড়ি আছ?' ডাকল ক্যারল। 'বাবা-মা? তোমরা উপরে?'

কারও কোনও সাড়া নেই। শুধুই নীরবতা। ক্যারল ধারণা করল বাবা-মা সকালে কাজে যাওয়ার সময় হয়তো ভুলে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রেখে গেছেন। কব্জিতে বাঁধা বেঢপ বড় আকারের ঘড়ির জ্বলজ্বলে ডায়ালে চোখ বুলাল ও। সাড়ে ছ'টা বাজে। মা-বাবা কই? ভাবছে ক্যারল। এ সময় তো তাঁদের বাড়ি থাকার কথা।

এ মুহূর্তে বাড়িতে একা থাকতেই পারবে না ক্যারল। আজ সকালেই রেডিওর খবরে শুনেছে গিনসবার্গ মেন্টাল হেলথ ফ্যাসিলিটি'র এক মানসিক রোগী পালিয়েছে। মানসিক হাসপাতালটা ওদের শহর হ্যাম্পটন ফলস থেকে মাইল তিনেক দূরে, আর পলায়নকারী ভয়ঙ্কর এক উন্মাদ খুনী। সে বৃদ্ধ দুই দম্পতি এবং তাদের নাতিকে জবাই করে হত্যা করেছে।

এসব খবর রেডিও ছাড়াও খবরের কাগজেও পড়েছে ক্যারল। কাগজে লিখেছে, খুনী মেয়েটি পাগল সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে কারাগারে না ঢুকিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল গিনসবার্গ মানসিক হাসপাতালে। মূলত হ্যাম্পটন ফলস-এর অধিবাসীরাই এ ব্যাপারে দাবি তুলেছিল। তাদের ভয় ছিল খুনী হাসপাতাল থেকে না আবার পালিয়ে এসে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেয়। পুলিশ এবং মানসিক হাসপাতালের পরিচালক ওই সময় আশ্বাস দিয়েছিলেন অত্যন্ত সুরক্ষিত ওই হাসপাতাল থেকে নাকি কারও পালাবার সুযোগ নেই। এসবই যে ফাঁকা বুলি ছিল এখন তা বোঝাই যাচ্ছে।

খবরের কাগজের সূত্র অনুসারে, হাসপাতালের আর্দালীকে মেরে অজ্ঞান করে খুনী এক ডাক্তারের গাড়ির ব্যাকসীটে লুকিয়ে পালিয়ে যায়। হাইওয়েতে ওঠার পরে সে ডাক্তারের পিঠে কাঁটাচামচ ঠেকিয়ে লোকটির টাকা-পয়সা, ঘড়ি ইত্যাদি কেড়ে নিয়ে একটি সরু রাস্তায় গাড়ি ঢোকানোর নির্দেশ দেয়। তারপর হঠাৎ করে ডাক্তারকে গাড়ি থামাতে বলে সে গাড়ি থেকে লাফ মেরে নেমে পড়ে এবং এক ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায় জঙ্গলে।

খুনী এ মুহূর্তে জঙ্গলে আছে নাকি হ্যাম্পটন হিলস-এর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, জানে না কেউ। যদিও শহরের সবাই, ক্যারলসহ, সিঁটিয়ে আছে মৃত্যুভয়ে। পুলিশ শহরবাসীকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছে, বলেছে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে এবং চোখ কান খোলা রাখতে। খুনী বা রহস্যময় কোনও কিছু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

থার্মোস্টাট চালু করে গায়ের ভেজা কোট খুলে ফেলল ক্যারল। চলল ডেন-এর দিকে। আলো জ্বালল। ঘরের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। আসবাব আগেরগুলোই, তবে কয়েকটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মা হয়তো নিজের রুচিমত সাজাতে গিয়ে এ কাজ করেছেন, ভাবল ক্যারল। সে টেলিভিশনের সামনে বসে অন করল রিমোটের সুইচ।

দু'টোর খবর দেখাচ্ছে টিভি। পলাতক খুনী সম্পর্কে বলছে খবর পাঠক। একটি মুখ ভেসে উঠল টিভি পর্দায়। রিপোর্টার খুন হয়ে যাওয়া এক কিশোরের মায়ের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে।

'রনি খুব হাসিখুশি স্বভাবের ছিল,' বলল পাতলা লালচুলের মহিলা। 'জীবনটাকে দারুণভাবে উপভোগ করত ও, ছিল খুব স্মার্ট। বয়স নয় হলে কী হবে, ওই বয়সেই দাবায় সবাইকে হারিয়ে দিত রনি। কে জানে ও হয়তো একদিন চ্যাম্পিয়ন হয়ে

উঠতে পারত,' মহিলা চোখ মুছল। 'কিন্তু আর কোনওদিন চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না ও।'

পর্দার ছবি বদলে গেল। ক্লোজ আপে দাবার সেট দেখা গেল। মহিলা রাজাকে তুলে নিল সেট থেকে।

'খুবই দুঃখজনক,' বিড়বিড় করল ক্যারল। 'বেচারী মা। বেচারা ছেলে।' চোখ পিটপিট করে অশ্রু ঠেকিয়ে রাখল ও। 'এমন কাজ কে করল?'

মহিলার শোকাতুর চেহারা দেখতে কষ্ট লাগছে ক্যারলের। সে চ্যানেল বদলাল। কিন্তু এখানেও সেই একই গল্প। লম্বা, কালো চুলের এশীয় এক উপস্থাপিকা এক মনোবিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছে।

'ড. গ্যারিসন,' জিজ্ঞেস করল সে, 'খুনীর মানসিক ভারসাম্যহীনতা কীরকম হতে পারে?'

টাক মাথা, মোটাসোটা ড. গ্যারিসন গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'এ ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ ভুলে যায় নিজের পরিচয়। সে কে, কোত্থেকে এসেছে তা জানে না, সে যে কোনও অপরাধ করেছে তাও তার স্মৃতিতে থাকে না। তার ভেতরে আরও যেসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে বিভ্রান্তি, কাউকে চিনতে বা বুঝতে না পারা, সে অদ্ভুত সব শব্দ শোনে, উল্টোপাল্টা সব দৃশ্য দেখে। সে এমন কিছু দেখতে পায় যার কোনও অস্তিত্বই নেই। এমন সব শব্দ সে শোনে আসলে সেরকম কোনও শব্দই হয়নি, সবই তার মস্তিষ্ক প্রসূত।'

'এ অসুখের কারণ কী?'

'বেশিরভাগ সময় এরকম হওয়ার কারণ মস্তিষ্কের ভারসাম্যহীনতা। তবে ইদানীং কিছু ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে যার সাহায্যে এ অসুখ সারানো যায়। তবে চিকিৎসাটা—'

চিকিৎসার বিবরণ শোনা হলো না ক্যারলের। ওর খুব ভয় লাগছে। তাই অফ করে দিল রিমোটের সুইচ। কালো হয়ে গেল টিভি পর্দা।

মন থেকে ভয়ঙ্কর ঘটনাটা দূর করে দিতে চাইল ক্যারল। সামনের জানালায় গিয়ে ফাঁক করল পর্দা। উঁকি দিল। অবশেষে থেমেছে বৃষ্টি। তবে বাতাসের উন্মাদনায় বিরতি নেই। দমকা হাওয়ায় ঝর্নার মত পাতা থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে বৃষ্টির জল। একটা গাড়ি চলে গেল, ভেজা রাস্তায় হিস্‌স্ শব্দ তুলে।

রাস্তার মাথায় একটা পুলিশের গাড়ি চোখে পড়ল ক্যারলের। আস্তে চলছে, সার্চলাইটের তীব্র আলো ফালাফালা করে দিচ্ছে অন্ধকার, বাড়িঘরের সামনের অংশ, বেড়া, গাছ ইত্যাদি আংশিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এক মুহূর্তের জন্য ক্যারলদের বাড়িতে স্থির থাকল আলোক রেখা, তারপর চলে গেল গাড়ি। দানবের লাল চোখের মত টেল লাইট জোড়া কিছুক্ষণ জ্বলতে দেখল ক্যারল। অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ি।

পর্দা আবার টেনে দিল ক্যারল। ফিরে এল রান্নাঘরে। ভাঙা জানালা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল। গা শিরশির করে উঠল ক্যারলের। হাত এবং পায়ের ব্যান্ডেজ পরীক্ষা করে দেখল ও। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। ব্যথাও তেমন লাগছে না।

খিদে পেয়েছে ক্যারলের। ফ্রিজ খুলল। পেয়ে গেল ঠাণ্ডা ফ্রুট সালাদ এবং কটেজ চীজ। একটা প্লেটে খাবারগুলো সাজাল ও, বসল টেবিলে। খেতে লাগল। ভাবছে বাবা-মা আসছেন না কেন? গেছেন কোথায় তারা?

হঠাৎ ক্যারলের পেছনে, দেয়ালে ঝোলানো ফোন বেজে উঠল, লাফিয়ে উঠল ক্যারল। বাবা-মা অ্যাক্সিডেন্ট করেননি তো? এ জন্যই কী তাঁদের দেরী হচ্ছে? ভয়ে শিরশির করছে গা,

রিসিভার তুলল ও।

'হ্যালো,' ঢোক গিলল ক্যারল।

ঠাণ্ডা একটা মহিলা-কণ্ঠ শুনতে পেল সে এক মুহূর্তের জন্য। তারপর সব নীরব।

'কে বলছেন?' দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল ক্যারল।

ও প্রান্তে সাড়া নেই, হাহাকারের মত নিঃশ্বাস ফেলল কেউ। ওর মা? আহত হয়েছেন?

'হ্যালো!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যারল।

লাইনের অপর প্রান্তে শব্দ হলো খুট করে। কেটে গেল লাইন। শুধু ডায়াল টোন শোনা যাচ্ছে।

ফোন ছেড়ে দিল ক্যারল। বাতাসে হয়তো ফোনের তার-টার ছিঁড়ে গেছে, ভাবল ও। কিন্তু কথাটা নিজেরই বিশ্বাস হলো না। কেউ, হয়তো ওই পলাতক খুনীই ওকে নিয়ে খেলছে, যন্ত্রণা দিচ্ছে। খিদেটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল ক্যারলের, বমি আসছে। মাথাটাও ধরেছে। আধ-খাওয়া খাবার একটা প্লাস্টিকের কাগজে মুড়ে ফ্রিজে রেখে দিল ও।

কল-এ পিরিচ ধুচ্ছে, অকস্মাৎ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। বাড়ির কোথাও, সম্ভবত উপরতলায়, দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে গেছে একটি দরজা।

বাতাসের ধাক্কায় হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে কোনও দরজা কিংবা জানালা, নিজেকে ব্যাখ্যা দিল ক্যারল। এক মুহূর্তের জন্য রিল্যাক্স বোধ করল। কিন্তু সত্যি কি বাতাসের ধাক্কায় বন্ধ হয়েছে দরজা? নাকি উপরতলায় কেউ আছে? ভয়টা আবার কাঁপিয়ে দিল ক্যারলকে।

ভীত, সন্ত্রস্ত ক্যারল বেরিয়ে পড়ল রান্নাঘর থেকে, ঢুকল হলঘরে। মাথার উপরে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে আপত্তি জানাল ফ্লোর

বোর্ড, দোতলায় আরেকটি দরজা বন্ধ হলো। এবারে আস্তে।

ভাগো? পালাও এ বাড়ি থেকে! ক্যারলের মাথার ভেতরে বলে উঠল একটি কণ্ঠ।

রিল্যাক্স, বলল আরেকটি কণ্ঠ। তুমি বেহুদাই ভয় পাচ্ছ। কিন্তু ভয়টা তাড়াতে পারছে না ক্যারল। চাবিটা সাধারণত যে জায়গায় থাকার কথা সেখানে ছিল না কেন? কেউ– খুনী কি চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে? খুনীই কি দোতলার বাতি জ্বালিয়েছে? বাড়ির কোথাও কি সে লুকিয়ে আছে? অন্য কোনও ঘরে... ক্লজিট... কিংবা খাটের নীচে? স্থির হও। নিজেকে শোনাল ক্যারল। কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিচ্ছ তুমি।

বুক ভরে দম নিল ক্যারল, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। একেকবারে একেক ধাপ। দোতলার ল্যান্ডিং-এ চলে এল, সামান্য খোলা একটি দরজা থেকে আলো আসছে। পরক্ষণে ঘাড়ের কাছের চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। ঘরে কেউ হাঁটাহাঁটি করছে। শোনা যাচ্ছে পায়ের আওয়াজ। খুট করে একটা শব্দ হলো, ঘরের ভেতরটা আরও আলোকিত দেখাল, প্রায় একই সময় চালু হয়ে গেল টিভি।

আতঙ্কিত ক্যারল দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিল, বুকের খাঁচায় দমাদম পিটছে হৃৎপিণ্ড। ঘরে কে? একটা কণ্ঠ বিস্ফোরিত হলো ওর মস্তিষ্কে। কে?

পা টিপে টিপে সিঁড়ির শেষ ধাপের দিকে এগোল ক্যারল, ঘরে যে-ই হোক দেখবে, হঠাৎ একটা গলা শুনতে পেয়ে জমে গেল ও। মহিলা কণ্ঠ!

জায়গায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ক্যারল, নড়তে ভুলে গেছে। নিঃশ্বাস হয়ে উঠল হিসহিসে।

আরেকটি গলা শুনতে পেল ক্যারল। বাবার গলা।

'কাউকে আঘাত কোরো না,' বললেন তিনি। 'আমরা চাই না তুমিও আঘাত পাও।'

এরপর শোনা গেল মা'র কণ্ঠ। 'প্লীজ, বোঝার চেষ্টা করো সবাই তোমাকে সাহায্য করতে চাইছে।'

উন্মাদ খুনী তা হলে তার বাবা-মা'কে আটক করেছে! ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল ক্যারল। বাবা-মা'র সাহায্য দরকার। ওদেরকে সাহায্য করতে হবে।

ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলল ক্যারল। ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল ভেতরে। খুনীর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোথায় খুনী? শূন্য ঘর। টিভি চলছে। টিভিতে দেখা যাচ্ছে তার বাবা-মা একটি সোফায় বসে আছেন। তাঁদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে এক খবর-পাঠক। কিন্তু টিভিতে যে ঘরটি দেখছে ক্যারল তা তার পরিচিত ঘর নয়। বাবা-মাকেও যেন কেমন কেমন লাগছে। মনে হচ্ছে বেড়ে গেছে বয়স।

'আমি যদ্দূর জানি,' বলল নিউজ কাস্টার। 'আপনারা ওই খুনের ঘটনার কিছুদিন পরেই হ্যাম্পটন ফল্‌স-এর বাড়ি ছেড়ে টিম্বারলেনে চলে আসেন। ঠিক?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন ক্যারলের বাবা। 'আমরা তড়িঘড়ি বাড়ি বিক্রি করে চলে আসি। জিনিসপত্র কিছুই আনা হয়নি।'

'ও বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছিল না,' ব্যাখ্যা করলেন ক্যারলের মা। 'অমন ভয়ঙ্কর স্মৃতি নিয়ে ওই বাড়িতে বসবাস আমাদের জন্য দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।'

বাবা-মা এসব বলছেন কী? আপন মনে বলল ক্যারল। মিথ্যা বলছেন কেন ওঁরা? কেন বলছেন আমাদের বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন? আমি তো আমাদের আগের বাড়িতেই আছি।

পর্দায় নিউজকাস্টার বলছে, 'মানসিক হাসপাতাল থেকে আজ

সকালে পালিয়ে যাওয়া কিশোরীর বাবা-মা'র সাক্ষাৎকার তাদের টিম্বার লেনের বাড়ি থেকে সরাসরি প্রচার করা হলো। তাঁরা তাঁদের মেয়েকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। তাঁদের ধারণা, তাঁদের মেয়ে এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে আছে, সম্ভবত তার নিজেরও জানা নেই সে কোথায় আছে কিংবা সে কে।'

বাবা-মায়ের চেহারা আবার ভেসে উঠল পর্দায়। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ক্যারল।

'তুমি যদি এই সাক্ষাৎকার দেখে থাকো, সোনা,' বলছেন তার মা, 'তোমাকে বলছি, তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি আমরা। কারণ তোমাকে আমরা ভালবাসি।'

এরপর বাবাকে দেখা গেল। 'কর্তৃপক্ষ, পুলিশ কিংবা হাসপাতাল যে কারও কাছে খুশি তুমি যেতে পার। ওরা তোমাকে সাহায্য করবে, সুইটহার্ট।'

আমার বাবা-মা টিভিতে কী করছেন? অবাক ক্যারল। আমাকে নিয়ে এসব অদ্ভুত কথা বলার মানে কী?

ক্যারল হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল মিহি কান্নার শব্দে। হলঘরের শেষ প্রান্তে, তার বেডরুম থেকে ভেসে আসছে কান্না। ধীরে ধীরে, খুব আস্তে সে হলঘরের দিকে পা বাড়াল। ঢুকে পড়ল শোবার ঘরে। অবাক হয়ে দেখল ওর ঘরটিকে নার্সারীতে রূপান্তর করা হয়েছে। দোলনায় ফুটফুটে একটি বাচ্চা শুয়ে আছে, উ উ করে কাঁদছে। এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে তার। আর ঠিক তখন আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠতে চাইল ক্যারল।

হলঘর দিয়ে এগিয়ে আসছে এক কিশোরী। সেই উন্মাদ খুনী যার ছবি আজ খবরের কাগজে দেখেছে ক্যারল। মেয়েটির পরনে পুরুষের ওভারকোট, গালে লেপ্টে আছে ভেজা চুল, ভয়ে বিস্ফারিত চোখ।

আত্মরক্ষার জন্য কিছু পাওয়া যায় কিনা, পাগলের মত হাতড়াল ক্যারল। কিছুই পেল না। নিজের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটা কাঁটা চামচ। অগ্রভাগ সূচাল এবং ধারাল।

দোলনায় উঠে বসল বাচ্চা। তার কান্না চিৎকারে পরিণত হয়েছে।

'চুপ!' হিসিয়ে উঠল ক্যারল। চায় না বাচ্চার চিৎকার শুনে আকৃষ্ট হোক খুনী। মাথার উপর কাঁটা চামচ ধরে রেখে বাচ্চাটির দিকে ছুটে গেল ও। 'চুপ!' মেয়েটির মুখে হাত চাপা দিল।

'চুপ!' হিসিয়ে উঠল খুনী, ব্যঙ্গ করছে ক্যারলকে। তারও হাতে কাঁটা চামচ।

'চলে যাও!' গলা ফাটাল ক্যারল। বাচ্চাকে ছেড়ে দিল ও, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এগোল খুনীর দিকে।

'চলে যাও!' ভেংচাল খুনী। সে-ও হাতের অস্ত্র নিয়ে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত।

'ফিরে যাও বলছি! তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি!'

ঘোঁত ঘোঁত করল ক্যারল। পুনরাবৃত্তি করল খুনীও।

'তোমাকে বাচ্চাটার ক্ষতি করতে দেব না!' বাচ্চা এবং খুনীর মাঝখানে দাঁড়াল সে।

তারপর বুক হিম করা চিৎকার দিয়ে খুনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যারল। হাতের কাঁটা চামচ দিয়ে উন্মাদের মত আঘাত করতে লাগল আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বকে।

অন্তর্ধান

'মিস ড্রেক,' বললেন মিসেস মিনসার। 'লবণ আর মরিচের কাজ শেষ হয়ে গেলে দুটোকে কি একটু মিশিয়ে দিতে পারবেন, প্লীজ?'

'দুঃখিত, আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করলেন মিস ড্রেক। 'আমি চোখে ভাল দেখি না, জানেনই তো। মোটেই ভাল দেখতে পাই না।' তাঁর হাত জোড়া কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে, ধাক্কা লেগে মাস্টার্ডের বাটি কাত হয়ে পড়ল। সাদা ধবধবে টেবিল ক্লথে দাগ ফেলল। মিসেস মিনসার হিসিয়ে উঠলেন।

'এ নিয়ে এক হপ্তায় তিনবার টেবিলক্লথ নোংরা করেছেন, মিস ড্রেক। আপনি জানেন এসব ধোয়ার জন্য ভোর চারটায় আমাকে ঘুম থেকে উঠতে হয়? এভাবে চললে আপনাকে আর রাখতে পারব না বলে দিলাম।'

মিস ড্রেকের ক্ষমা প্রার্থনার ধার ধারলেন না তিনি, ঘুরলেন ডাইনিং-রুমের দরজার দিকে। ট্রলিতে মাংসের প্লেট নিয়ে এগোলেন। তাঁর ধূসর চুল এক বিনুনি হয়ে খাড়া হয়ে আছে খুলির ওপর, চোখের রঙও ধূসর, লোকের নিন্দা করার সময় কঠোর হয়ে যায় চেহারা।

'ভোর চারটায় উঠে যত্তসব ফালতু কাজ,' বিড়বিড় করলেন বুড়ো মি. হিল। তবে তাঁর কথা কেউ শুনতে পেল না। 'টেবিলক্লথে মাস্টার্ডের একটু দাগ পড়েছে তো কী হয়েছে? খাবার ভাল হলে টেবিল ক্লথের চেহারা কে দেখে? উনি যদি ভোর চারটার সময়ই ওঠেন তা হলে সুস্বাদু পরিজের বদলে আমাদেরকে বাসী খাবার গেলান কেন?'

মিসেস মিনসারকে ফিরতে দেখে নিজের ব্রেড প্লেটের দিকে মনোযোগী হলেন মি. হিল। খাবারটা মোটেই ভাল হয়নি। 'ফিরনি দেব নাকি কলার পুডিং নেবেন, মি. হিল?'

'কলার পুডিং, ধন্যবাদ।' রঙহীন, কুৎসিত চেহারার পুডিংয়ের দিকে তাকিয়ে পেটের ভেতরে মোচড় দিল মি. হিলের। কলাগুলো এখনও কাঁচা, হজমের জন্য খুবই অনুপযোগী, তবু লবণ পোড়া ফিরনির চেয়ে ভাল।

'মি. ওয়েকফিল্ড! ঝোল মেখে জামাটার তো বারোটা বাজিয়েছেন! আবার শার্ট ধুতে হবে আমাকে। ওফ! আর পারি না। কাল আবার নতুন একজন মেহমান আসছেন। ভেবে পাই না বুড়ো মানুষ এত অবুঝ হয় কী করে!'

'আমি শার্ট ধুয়ে নেব, মিসেস মিনসার। আমারটা আমিই কেচে দেব'খন।' হাত দিয়ে ঝোলের দাগ আড়াল করলেন মি. ওয়েকফিল্ড। চেহারায় উদ্বেগ।

'আপনি একা তো কোনও কাজই করতে পারেন না।'

'নতুন মেহমানটি কে, মিসেস মিনসার?' প্রতিবেশীর দিক থেকে নজর ফেরাতে প্রশ্নটা করলেন মি. হিল।

'মি. ওলেনডড। ভারত থেকে আসছেন।' চোখ মুখ কোঁচকালেন মিসেস মিনসার। 'আশা করি ঢাউস কোনও লাগেজ সঙ্গে নিয়ে আসবেন না তিনি। তা হলে ওই মাল রাখব

কোথায়?'

'ভারত,' বিড়বিড় করলেন মি. হিল। 'ভারত থেকে, অ্যাঁ? এ জায়গাটা হয়তো তাঁর পছন্দ হবে না।' বালমোরাল গেস্ট হাউজের ডাইনিং রুমে তাকালেন তিনি। নাম বালমোরাল আর মিসেস মিনসারের নিম্নভূমির বাসিন্দাদের মত উচ্চারণ ছাড়া এ গেস্ট হাউজে আইরিশ অন্য কোনও উপাদান নেই। সাগর এখান থেকে আধা মাইল দূরে, তবে এ বাড়ি থেকে দেখার জো নেই। এখানকার অধিবাসীদের কেউ অবশ্য সাগরে সাঁতার কাটতে যানও না। এ গেস্ট হাউজে সুবিধের মধ্যে কেবল ফুরফুরে সামুদ্রিক বাতাস আর তাজা মাছটা পাওয়া যায়।

মি. ওলেনডড পরদিন সকালেই চলে এলেন, সঙ্গে প্রচুর মাল-সামাল।

ট্যাক্সি ক্যাব থেকে একের পর এক ট্রাঙ্ক এবং সুটকেস—তার মধ্যে কিছু আবার একদম ভিন্ন চেহারার, খড়ের তৈরি, বাক্স এবং বেডরোল নামছে দেখে মিসেস মিনসারের গম্ভীর চেহারায় আরও আঁধার ঘনাল।

'উনি নিজেকে কী ভাবছেন?' বেশ জোরেই কথাটা বললেন মিসেস মিনসার তাঁর স্বামীকে শুনিয়ে। তিনি নতুন অতিথির সুটকেস বয়ে আনছেন।

মি. ওলেনডড বয়োবৃদ্ধ মানুষ, বাদামী গায়ের রঙ, ছোটখাট গড়ন, মাথার সমস্ত চুল পেকে সাদা। ক্যাব ড্রাইভারকে ভাড়া চুকিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আমার রুমে সব জিনিসপত্র রেখে এসেছ তো? ওটা তো ডাবল রুম, না! আমি ডাবলরুমের কথা বলেছি।'

মিসেস মিনসারের কাছে ডাবল রুম মানে ডাবল বেডের ঘর যেখানে গুঁতাগুঁতি করে ডাবল বেডের খাট পাতা যায়।

তিনি তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করছেন মি. ওলেনডডকে। এ লোক কি কোনও ঝামেলা পাকাবেন? তেমন সম্ভাবনা দেখা দিলে লোকটাকে ঘর ছেড়ে দেয়ার নোটিশ দিয়ে দেবেন। গরম আসছে। এ সময় গেস্ট হাউজগুলোর ঘরভাড়া চাহিদা অনুযায়ী এমনিতেই বেড়ে যায়। এখন অবশ্য হপ্তায় দশ গিনি ভাড়া রাখবেন মিসেস মিনসার।

মিসেস মিনসারের দুই ছেলে মেয়ে, মার্টিন এবং জেনি স্কুল থেকে ফিরেছে। মি. ওলেনডডের জিনিসপত্র দেখে তারা রীতিমত অভিভূত।

'দ্যাখো, একটা পর্দা। ছবিঅলা!'

'ওঁর বর্শাও আছে!'

'বাঘের চামড়া!'

'হাতির পা!'

'এটা কী, বর্ম?'

'না, এটা পাখা, ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরি।' ওদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলেন মি. ওলেনডড। হাসলে তাঁর মুখের চামড়া কুঁচকে যায়।

'উনি কি ভারতীয়, মা?' রান্নাঘরে এসে জিজ্ঞেস করল ওরা।

'না, অবশ্যই না। ওঁর গায়ের রঙ বাদামী কারণ উনি খুব গরম জায়গায় থাকেন,' তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিলেন মিসেস মিনসার। 'যাও, ঘরে গিয়ে হোমওয়ার্ক নিয়ে বসো গে। আমার পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করতে হবে না।'

গেস্টহাউজের বাসিন্দারাও মি. ওলেনডডকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

'আপনাদের কি মনে হয় লোকটা বিদেশী?' ফিসফিস

করলেন মিসেস পার্সি। 'কেমন অদ্ভুত দেখতে। চোখ দুটো এত উজ্জ্বল—হীরের মত ঝকঝক করছে। আপনি কী বলেন, মিস ড্রেক?'

'আমি কী করে বলব?' খেঁকিয়ে উঠলেন মিস ড্রেক। 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন গত পাঁচ বছর ধরে আমি চোখে ভাল দেখি না।'

বাচ্চারা মি. ওলেনডডের ঘরে ঢুকে পড়ল। তাদের ওপর কঠোর নিষেধ রয়েছে বৃদ্ধ নিবাসের কোনও অতিথির সঙ্গে কথা বলা যাবে না, মেলামেশা দূরে থাক। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় এই মানুষটি এবং তাঁর বিচিত্র জিনিসপত্রের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ওদেরকে নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করার সাহস যুগিয়েছে।

'আমাদেরকে ভারতের গল্প বলুন,' হলদে কাঁচের চোখঅলা বাঘের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আবদার করল জেনি।

'ভারত? সে দেশের পাহাড়গুলো নীল আর ঘন জঙ্গলে ভরা। এসেক্সের মতই নিরীহ চেহারা। তবে জঙ্গলে বাস করে বাঘ আর সাপ এবং বানর। গ্রামে ঢুকলে নাকে ধাক্কা দেবে ধূপ আর গোবরের গন্ধ, সেই সঙ্গে ধুলোয় ভরে যাবে জামা-কাপড়। ওখানকার মানুষ গোলাপ এবং লাল রঙের জামা গায়ে দেয়, তাদের গবাদি পশুর শিং একেকটা তিন হাত লম্বা।'

'আপনি আর কখনও ওখানে ফিরে যাবেন না?' জিজ্ঞেস করল মার্টিন। তার অবাক লাগছে ভেবে অমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে এই মানুষটা কেন এমন বিশ্রী জায়গায় এল। এ গেস্ট হাউজের ধূসর এবং কালো রঙের কার্পেট ছেঁড়া, হালকা ওয়ার্ড্রোব, ময়লা জমা প্লেট-গ্লাস, বেডরুমে কটকটে হলুদ রঙের চাদর বিছানো থাকে। দেখতেই ঘেন্না লাগে।

'না,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মি. ওলেনডড। 'শরীরটা ভাল

যাচ্ছে না আমার। তা ছাড়া ওখানকার কারও এখন আমাকে দরকার নেই। তবে,' খুশিখুশি গলায় যোগ করলেন তিনি, 'ওখান থেকে অনেক জিনিস নিয়ে এসেছি আমি। ভারতের স্মৃতি সহজে মুছে যাবে না মন থেকে। এগুলো দ্যাখো!'

প্রতিটি জিনিসই দেখার মত—চামড়ার চপ্পল, সিল্কের ড্রেসিং গাউন, রুমাল, দারুণ ছবি আঁকা পর্দা, প্রকাণ্ড আকারের কচ্ছপের খোলা, গায়ে ঝলমলে মুক্তা বসানো, হাসি মুখ, রাগান্বিত মানুষের ছবি, রঙিন সুগন্ধী চিনি।

'তোমরা কখনোই ওপরে যাবে না। লোকটা যদি তোমাদের কিছু খেতে দেয় সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেবে,' পইপই করে মানা করলেন মিসেস মিনসার। কিন্তু তিনি বাতাসের সঙ্গে কথা বলছেন। হোমওয়ার্ক শেষ করেই দুই ভাই-বোন সোজা মি. ওলেনডডের ঘরে। আবদার—সাপ এবং নেকড়ের গল্প শুনবে, শুনবে কুমিরের গল্প, যারা নাকি শতশত বছর বেঁচে থাকে। মন্দিরের রহস্যময় পূজা অর্চনার ব্যাপারেও তাদের আগ্রহের কমতি নেই, শুনতে চায় উল্টো পায়ের ভূতের কাহিনি এবং ডাইনির গল্প যারা কিনা দুধকে দই বানিয়ে ফেলতে পারে, প্রতিবেশীর বাগানের কাঁচা আঙ্গুর যাদু দিয়ে পাকিয়ে ফেলে।

'আপনি এসব সত্যি দেখেছেন? নিজের চোখে দেখেছেন? দেখেছেন সাপুড়ে বাঁশি বাজাচ্ছে আর সাপে লেজে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে? টিকটিকিকে আধ টুকরো করার পরেও কাটা শরীর নিয়েই পালিয়ে গেছে ওটা? জ্যান্ত ভেড়া শিকার করছে ঈগল?'

'সব নিজের চোখে দেখেছি,' বললেন মি. ওলেনডড। 'তোমরা শুনতে চাইলে আমি সাপুড়ের বাঁশি বাজিয়ে শোনাতে

পারি।

তিনি দেবদারু কাঠের বাক্স খুলে বাঁশের ছোট একটি বাঁশি বের করলেন, তাতে সুর তুললেন। তবে দু'একটির বেশি সুর তিনি জানেন না। তা-ই বাজান বারেবারে। তার বাঁশির সুরে ঘুম ভেঙে যায় টাফির। টাফি এ বাড়ির পোষা বেড়াল। বুড়ো হয়ে গেছে। যখন বাচ্চারা বাড়ি থাকে, তাদের পেছনে ঘুরঘুর করাই তার একমাত্র কাজ। ওরা স্কুলে গেলে সে মি. ওলেনডডের আরাম কেদারায় বসে ঝিমোয়। বাঁশির শব্দে কান খাড়া হয়ে যায় টাফির আর নীচতলায় বদমেজাজী এয়ারডেল কুকুর জিপ গরগর করে ডেকে ওঠে। আর মিসেস মিনসার, গরম ইস্ত্রিতে পানি ছিটাতে গিয়ে থেমে যান, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হাত দিয়ে কান ঘষতে থাকেন যেন কামড়ে দিয়েছে মশা।

'আমি আরও একটা জিনিস দেখেছি,' বলেন ওলেনডড। 'এক লোক মন্ত্রোচ্চারণ করতেই লেজে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে যায় রশি। রশিটা যেন সিঁড়ি, তরতর করে বেয়ে মাথায় উঠতে থাকে তার সাগরেদ। উঠতেই থাকে। তারপর একসময় অদৃশ্য হয়ে যায় চোখের সামনে থেকে।'

'ছেলেটা কোথায় যায়?' সমস্বরে প্রশ্ন করে ভাই-বোন, বিস্ফারিত চোখ।

'চলে যায় দূরের এক দেশে যেখানে নরম ঘাস জন্মায়, মাটিতে বিছিয়ে থাকে কার্পেটের মত, যেখানে হরিণ গলায় সোনার অলঙ্কার পরে, তারা তোমার কাছে আসবে হাত থেকে রুটি খাওয়ার জন্য, যেখানে কিশমিশের রঙ লাল এবং কমলার মত বড় ও মিষ্টি, সেখানকার মেয়েদের কণ্ঠ গায়ক পাখির মত।'

'ছেলেটা আর কখনও ফিরে আসে না?'

'মাঝে মাঝে হাত ভর্তি সবুজ ঘাস আর ফল নিয়ে আকাশ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে সে। তবে কখনও কখনও ফিরে আসে না।'

'রশিটাকে লোকটা কি মন্ত্র বলে, জানেন?'

'জানি। শুনেছি তো।'

'ওই ছেলেটার জায়গায় যদি আমি হতাম তা হলে কখনোই এখানে ফিরে আসতাম না।' বলল জেনি। 'আরও গল্প বলুন না। ডাইনিটার কথা বলুন যে পাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করে।'

'ময়ূরের পালকের পাখা দিয়ে নিজেকে সে বাতাস করে,' বললেন মি. ওলেনডড। 'বাতাস করার সময় সে সাপ হয়ে যায় এবং চলে যায় বনে। সাপ-জীবন যখন আর ভাল লাগে না তার, মানুষ হতে চায়, সে তার স্বামীর পায়ে ঠাণ্ডা মাথা দিয়ে ঘষতে থাকে। তার স্বামী তাকে পাখা দিয়ে বাতাস করলে আবার মানুষ হয়ে যায়।'

'আপনার দেয়ালে ঝোলানো পাখাটার মত ওটা?'

'একদম ওটার মত।'

'আমরা একটু বাতাস খাব?'

'আর সাপ হয়ে যাও, না? তোমাদের মা আমাকে তখন কাঁচা খেয়ে ফেলবেন।' হো হো হাসিতে ফেটে পড়েন মি. ওলেনডড।

বাচ্চারা তাদের মাকে সাপ, হরিণ, জ্যান্ত রশি, পাখি কণ্ঠি মেয়ে, কমলার মত বড় কিশমিশের গল্প শোনায়। শুনে দাঁত কিড়মিড় করেন মিসেস মিনসার।

'যত্তসব আজগুবী গল্প শুনিয়ে বাচ্চাগুলোর মাথা খেয়েছে,' দাঁতে দাঁত পিষে স্বামীকে অনুযোগ করেন তিনি। 'লোকটাকে

কড়াভাবে বলে দেব আমার বাচ্চাদের ছায়াও যেন না মাড়ায়।'

'আহ্, হান্না, থাক না,' তরল গলায় বলেন তাঁর স্বামী।

'বুড়ো মানুষটা গল্প শুনিয়ে অন্তত দুষ্টুমির হাত থেকে তো তোমাকে রক্ষা করছেন। বাচ্চারা রান্নাঘরে ঢুকুক কিংবা বাগানে ছোটাছুটি করুক, কোনও কিছুই তো সহ্য করতে পার না তুমি। লোকটা ওদেরকে স্রেফ ভারতীয় রূপকথার গল্প শোনাচ্ছেন।'

'তোমরা ওই লোকটার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না,' ছেলেমেয়েদের হুকুম করলেন মিসেস মিনসার। 'একটা কথাও না।'

কিন্তু বাতাসকে নিষেধটা করা হলো...

বুড়ো টাফি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে হলওয়ের মাঝখানে মড়ার মত পড়ে থাকে। মি. ওলেনডড বেড়ালটার ওপর ঝুঁকে আছেন দেখে মিসেস মিনসারের মেজাজ হঠাৎই চড়ে গেল।

'নোংরা বেড়ালটাকে ছোঁবেন না। ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার সময় হয়েছে।'

'ওর ঠাণ্ডা লেগেছে। এর বেশি কিছু না,' মৃদু গলায় বললেন মি. ওলেনডড। 'আপনি অনুমতি দিলে ওকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করব। আমার কাছে কিছু ভারতীয় ওষুধ আছে, ঠাণ্ডার অসুখ সেরে যায়।'

কিন্তু মি. ওলেনডডের প্রস্তাব পছন্দ হলো না মিসেস মিনসারের। তিনি পশু চিকিৎসককে ফোন করলেন। বাচ্চারা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখে টাফি নেই।

মি. ওলেনডডের ঘরে গেল ওরা। শোকাহত।

ওদের দিকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকলেন মি. ওলেনডড, তারপর বললেন, 'তোমাদেরকে একটা গোপন

কথা বলি?'

'বলো। বলো।' চেঁচিয়ে উঠল মার্টিন। বুড়োর সঙ্গে ওদের খুব ভাব হয়ে গেছে তাই আর 'আপনি' সম্বোধন করে না। জেনি চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি টাফিকে এখানে লুকিয়ে রেখেছ, না?'

'না, ঠিক তা নয়,' বললেন মি. ওলেনডড। 'আচ্ছা, দেয়ালের ওই আয়নাটা দেখতে পাচ্ছ?'

'শাল দিয়ে ঢাকা জিনিসটার কথা বলছ? হ্যাঁ।'

'ওই আয়নার মালিক ছিল এক ভারতীয় রানি। খুবই সুন্দরী ছিল সে। এতই সুন্দরী, লোকে তার দিকে তাকালেই সুস্থ হয়ে যেত। বয়স বাড়তে থাকে রানির, সেই সঙ্গে হারাতে থাকে রূপ। কিন্তু ওই আয়নাটা তাকে মনে করিয়ে দিত কত সুন্দরী ছিল সে। আয়নায় তাকালেই রানি নিজের হারিয়ে যাওয়া সুন্দর মুখখানা দেখতে পেত। একদিন সে আয়নার ভেতরে ঢুকে পড়ে। আর তার খোঁজ মেলেনি। তোমরা আয়নায় তাকালে ওদেরকে দেখতে পাবে। তবে ওদের বর্তমান চেহারা নয়, আগের রূপ।'

'তাকাব?'

'অল্প একটু সময়ের জন্য দেখতে পারো। ওই চেয়ারটাতে উঠে দাঁড়াও।' বললেন মি. ওলেনডড, হাসছেন। ওরা চেয়ারে উঠে আয়নায় তাকাল। মি. ওলেনডড ওদের দু'হাতে পেছন থেকে ধরে রাখলেন যাতে চেয়ার থেকে পড়ে না যায়।

'ওহ্!' চেঁচিয়ে উঠল জেনি, 'আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি! আমি টাফিকে দেখতে পাচ্ছি! ও বেড়াল ছানা হয়ে গেছে, ঘাস ফড়িং-এর পেছনে ছুটছে।'

'আমিও ওকে দেখতে পাচ্ছি!' গলা ফাটাল মার্টিন। লাফাচ্ছে। চেয়ারটা ওদের লাফঝাঁপ সইতে পারল না। উল্টে গেল। ওরাও মেঝেতে ধপাশ।

'আবার দেখাও না! প্লীজ, আরেকবার!'

'আজ এটুকুই,' বললেন মি. ওলেনডড। 'আয়নার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তোমরাও রানির মত চিরদিনের জন্যে ভ্যানিশ হয়ে যেতে পার। এ জন্যই আয়নাটা শাল দিয়ে ঢেকে রাখি আমি।'

বাচ্চারা খুশিতে লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে এল। ওদের চোখে শিশু টাফির দৌড়ঝাঁপ ভাসছে। ওরা খুব খুশি টাফির এ চেহারা দেখে। মি. ওলেনডড ওদেরকে হাতির দাঁতের ছোট দাবার সেট দিয়েছেন। টাফির কথা ভেবে যাতে বাচ্চাগুলোর মন খারাপ না হয়, খেলায় ব্যস্ত থাকলে ভুলে যাবে সব।

কিন্তু মিসেস মিনসার ওদেরকে দাবার সেটা ধরতেই দিলেন না। বললেন ওদের দাবা খেলার এখনও বয়স হয়নি এবং এত সুন্দর সেট নষ্ট করে ফেলবে। তিনি বাচ্চাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে সেটটি বিক্রি করে দিলেন। টাকাটা রেখে দিলেন ডাকঘরে, 'ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

জুলাই চলছে। দিন দিন বাড়ছে গরম। মিসেস মিনসার মি. ওলেনডডকে বললেন, 'গ্রীষ্মের ভাড়া' হিসেবে তিনি তিন গিনি ভাড়া বাড়াতে বাধ্য। ভেবেছিলেন ভাড়া বৃদ্ধির কথা শুনে বৃদ্ধ পাততাড়ি গোটাবেন। কিন্তু টাকাটা দিয়ে দিলেন তিনি।

'আমি বুড়ো, ক্লান্ত একজন মানুষ,' বললেন মি. ওলেনডড। 'আবার নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। হয়তো বেশিদিন বাঁচব না। এখানেই হয়তো শেষ নিশ্বাসটা ত্যাগ করব একদিন।'

বৃষ্টির এক দিনে তিনি সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। টানা এক হপ্তা বিছানায় পড়ে থাকলেন।

'এ লোক যদি সারাক্ষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে তো তাকে আমার দরকার নেই,' মিসেস মিনসার বললেন তাঁর স্বামীকে। 'বলব শীঘ্রি তাঁর ঘরটা আমাদের দরকার। কাজেই উনি যেন কেটে পড়েন।' এদিকে তিনি মি. ওলেনডডের ভারতীয় সংগ্রহের অনেক কিছুই সরিয়ে ফেললেন এ অজুহাতে যে এগুলোতে ধুলো জমে ঘরটাকে নোংরা করে রেখেছে। তবে তরবারি, পাখা এবং আয়না থাকল যথাস্থানে। ওগুলো দেয়ালে ঝুলছিল। ঘরের নাকি তেমন ক্ষতি করছিল না এ জিনিস ক'টি।

মি. ওলেনডড যেদিন বিছানা ছাড়লেন, একটু হাঁটাহাঁটি করছেন, মিসেস মিনসার সোজা গিয়ে কাঠখোট্টা গলায় বললেন তাঁর ঘরটা তাঁদের দরকার হয়ে পড়েছে এবং তাঁকে চলে যেতে হবে।

'কিন্তু কোথায় যাব আমি?' ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন মি. ওলেনডড, কাঁপছেন থরথর করে। মিসেস মিনসারের কেমন অস্বস্তি লেগে উঠল। কারণ দেয়াল ঘড়িটা হঠাৎ টিকটিক থামিয়েছে, যেন তাঁর জবাব শুনতে চাইছে।

'কোথায় যাবেন তার আমি কী জানি,' শীতল শোনাল মিসেস মিনসারের কণ্ঠ। 'যেখানে খুশি যান। এমন কোথাও যেখানে আপনার এসব আবর্জনা দেখেও লোকে আপনাকে আশ্রয় দেবে।'

'আচ্ছা, আমাকে একটু চিন্তা করার সময় দিন,' বললেন ওলেনডড। পানামা হ্যাট মাথায় চড়ালেন, ধীর পায়ে রওনা হয়ে গেলেন সাগর-সৈকতে। এখন ভাটার টান চলছে। তীরের

অনেকখানি জুড়ে থকথক করছে কাদা। কাদায় আটকে রয়েছে নানা হাবিজাবি জিনিস। জেনি এবং মার্টিনও সৈকতে চলে এসেছে। ঘরে বানানো ঘুড়ি ওড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু একফোঁটা বাতাস নেই। ঘুড়ি গোত্তা খেয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু এখন বাড়ি ফেরা যাবে না। সন্ধ্যা ছ'টার আগে বাড়ি যাওয়া নিষেধ। গেলে আবার এখানে পাঠিয়ে দেবেন মা।

'ওই যে, মি. ওলেনডড,' আঙুল তুলে দেখাল জেনি।

'ওঁকে বলে দেখি। উনি হয়তো ঘুড়িটা ওড়াতে পারবেন,' বলল মার্টিন।

এক ছুটে মি. ওলেনডডের কাছে চলে এল ওরা ভেজা বালুতে পায়ের ছাপ ফেলে।

'দাদু, তুমি আমাদের ঘুড়ি উড়িয়ে দেবে?'

'ঘুড়ি নিয়ে খুব জোরে দৌড়াতে হবে। নইলে ঘুড়ি উড়বে না।'

তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। খুব আস্তে হাঁটছেন তিনি, তবু বুকের ভেতর কলজেটা লাফাতে শুরু করেছে পাগলা ঘোড়ার মত।

'দেখি তো পারি কিনা,' বললেন তিনি। হাতে ঘুড়ির রশি ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন এক মুহূর্ত। তারপর বললেন, 'বাচ্চারা, আমি ঘুড়ি নিয়ে দৌড়াতে পারব না। তবে এটা যাতে নিজেই আকাশে ওড়ে সে ব্যবস্থা করতে পারব।'

বাচ্চারা চুপচাপ, কৌতূহল নিয়ে লক্ষ করছে তাঁকে। তিনি ঘুড়ির রশির মত মোটা সুতো লক্ষ্য করে নিচু গলায় কী যেন বললেন, বুঝতে পারল না ওরা।

'দ্যাখো, ঘুড়ি নড়ছে,' ফিসফিস করল মার্টিন।

মাটিতে খোঁড়া হয়ে পড়ে থাকা ঘুড়ি হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে

খাড়া হলো, তারপর ধীরে ধীরে উঠতে লাগল শূন্যে, যেন অদৃশ্য কিছু আকাশ থেকে টানছে ওটাকে। ওপরে উঠতে লাগল ঘুড়ি। ধূসর, উষ্ণ আকাশ লক্ষ্য করে উঠতেই লাগল। মি. ওলেনডড স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন ওটার দিকে; জেনি লক্ষ করল বুড়ো মানুষটা মুঠো করে রেখেছেন হাত, কপাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে।

'সেই গল্পের মত!' উত্তেজনায় লাফাল মার্টিন। 'রশিঅলা সেই লোকটা যে যাদু দিয়ে তার সাগরেদকে অদৃশ্য করে দিয়েছিল—আমরা উঠি? রশি বেয়ে কীভাবে উঠতে হয় স্কুলে শিখিয়েছে আমাদেরকে।'

মি. ওলেনডড চুপ করে রইলেন। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিল দুই ভাই-বোন। তারা ঘুড়ির শক্ত সুতো ধরে ঝুলে পড়ল, তরতর করে ওপরে উঠতে লাগল। সুতো বা রশির শেষ প্রান্তটা এখনও মুঠোয় ধরে আছেন মি. ওলেনডড, আস্তে আস্তে বসে পড়লেন মাটিতে। তাঁর মাথা এসে ঠেকল হাঁটুতে। হঠাৎ এক পাশে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। খুলে গেল মুঠো, স্প্রিং-এর মত লাফ দিল ঘুড়ির সুতো। সাঁৎ করে উঠে গেল ওপরে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল মেঘের আড়ালে।

একটু পরে সাগরে জোয়ার এল। ঢেউ এসে ধুয়ে নিয়ে গেল বালুতে তিন জোড়া পায়ের ছাপ।

'বাচ্চাগুলো এখনও ফিরছে না কেন,' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন মিসেস মিনসার। 'ছ'টা বাজে। ওরা কি মি. ওলেনডডের ঘরে?'

তিনি ওপরে উঠে এলেন। কিন্তু বুড়ো মানুষটির ঘর খালি।

'পরের বার কোনও দম্পতিকে ভাড়া দেব এ ঘর,' গজগজ

করছেন মিসেস মিনসার। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন ময়ূরের পালকের পাখা। বড্ড গরম পড়েছে। পাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে মনের অসন্তোষ প্রকাশ করে চললেন। 'দম্পতিদের ভাড়া দিলে টাকাও বেশি পাব, তারা বাইরে থেকে খেয়ে আসবে। রান্নার ঝামেলাও পোহাতে হবে না। ভাবছি, বাচ্চাগুলো গেল কোথায়...?'

এক ঘণ্টা বাদে মি. হিল বাড়ি ফিরলেন সাপার খেতে। মি. ওলেনডডের দরজা খোলা দেখে উঁকি দিলেন। আঁতকে উঠলেন কার্পেটে একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে দেখে। উত্তেজিত গলায় লোকজন ডাকাডাকি শুরু করলেন। তাঁর চিৎকার শুনে যখন মি. মিনসার এলেন, সাপটা ততক্ষণে বিছানার নীচে লুকিয়েছে। মিসেস পার্সি ভয়ের চোটে হাউমাউ করছেন। মি. মিনসার একটা লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে খাটের নীচ থেকে বের করে আনলেন সাপটাকে। সাপটা তাঁর পা লক্ষ্য করে তেড়ে এল। দেয়াল থেকে ধারাল একটা তরবারি নিয়ে আগেই প্রস্তুত ছিলেন মি. মিনসার। এক কোপে সাপের কল্লা নামিয়ে দিলেন। দরজার বাইরে ভিড় করে দাঁড়ানো বুড়ো মানুষগুলো তাঁর দ্রুত রিফ্লেক্সের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।

'চিন্তা করেন মি. ওলেনডড সাপ পুষতেন অথচ আমরা তা জানতামই না!' শিউরে উঠলেন মিসেস পার্সি।

'আশা করি সাপটার আর কোনও সঙ্গী টঙ্গি নেই।' ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি। 'বাহ, বেশ সুন্দর আয়না তো!'

সোল্লাসে চেঁচালেন বৃদ্ধা। অন্যরাও আয়নাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। একে অপরকে ধাক্কা মেরে আগে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে চাইছেন।

মি. মিনসার দলটাকে ঠেলে, সরিয়ে বিরক্ত চেহারা নিয়ে নেমে এলেন নীচে। হাতের লাঠিতে ঝুলছে মরা সাপ।

'আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাইকে সাপার খেতে ডাকব।' গলা চড়ালেন তিনি। 'হান্না! হান্না! কোথায় তুমি? এ বাড়ির আজ সব কেমন উল্টোপাল্টা চলছে।'

হান্না, বলাবাহুল্য, জবাব দিলেন না। পাঁচ মিনিট পরে মি. মিনসার ঘণ্টা বাজালেন। সাপার খেতে আসার আহ্বান। কিন্তু কেউ এলেন না, শুধু অন্ধ মিস ড্রেক বাদে। তিনি ভীরু কণ্ঠে জানালেন, তাঁকে সবাই মি. ওলেনডভের ঘরে একা ফেলে রেখে চলে গেছেন।

'ওরা চলে গেল! আমাকে ফেলে! ওই ভয়ঙ্কর জিনিসগুলোর মধ্যে আমাকে একা রেখে! একটা কথাও কেউ বলার প্রয়োজন অনুভব করল না! আমার যদি কিছু হয়ে যেত!'

তিনি দ্রুত বসে পড়লেন ডাইনিং টেবিলে, গপগপ করে খেতে লাগলেন মিসেস পার্সির জন্য বেড়ে রাখা মাখন মাখানো টোস্ট।

মূল গল্প: জোন আইকেনের 'দ্য ম্যান হু হ্যাড সিন দ্য রোপ ট্রিক।'

লোকটা

ভোর চারটা বাজে। কিন্তু এখনও ঘুমাতে যাবার সাহস পাচ্ছি না।

আমার বর্তমান দুর্দশার শুরু মাস তিনেক আগে, যেদিন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি।

বাবা মারা যাবার দু'বছরের মধ্যে তাঁর জমানো সমস্ত টাকা উড়িয়ে দিই আমি। ছোটখাট চাকরি করতাম মাঝে মাঝে আর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবতাম আমার পছন্দের ঘোড়াগুলো যদি আরেকটু জোরে ছুটতে পারত, কত ভালই না হত।

অভাব অনটনে জর্জরিত আমি যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল, সিদ্ধান্ত নিলাম এ জীবন আর রাখব না। এত কষ্ট করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। আর আত্মহত্যার জন্য টিউব রেলওয়ে উৎকৃষ্ট স্থান। রেল লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকো, ব্যস–তোমার সব দুঃখ-কষ্ট কাটা পড়ে যাবে রেল গাড়ির চাকার নীচে।

আত্মহত্যার সিদ্ধান্তে অটল আমি সেদিনও সান্ধ্যকালীন পত্রিকা কেনার লোভ সামলাতে পারিনি। চলন্ত সিঁড়ির দিকে এগুতে এগুতে কিনে ফেললাম সেদিনকার খবরের কাগজ। আগামীকাল বিকেল সাড়ে চারটায় যে ঘোড়দৌড়টা হবে, সে রেসের একটা ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেছিলাম আমি। যদিও জানি

আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনন্ত লোকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হয়ে যাবে আমার। তবু কোন্ কোন্ ঘোড়া রেসে অংশ নিচ্ছে জানার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। যদিও এই চতুষ্পদ প্রাণীগুলোর ওপরে বাজি ধরতে গিয়েই গত দু'বছরে ফতুর হয়ে গেছি।

যে লোকটার কাছ থেকে খবরের কাগজ কিনেছি সে আকারে ছোটখাট, গালে মাফলার জড়ানো। কাপড়ের টুপিটা চোখ প্রায় ঢেকে রেখেছে। তার কাছে একটিই মাত্র কাগজ ছিল। তার হাত থেকে কাগজ নেয়ার সময় শিরশির করে উঠল গা। ইচ্ছে করে সে যেন ছুঁয়ে দিয়েছিল আমার হাত। তার আঙুলগুলো বরফের মত ঠাণ্ডা।

সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় 'স্টপ প্রেস' লেখাটিতে চোখ বুলালাম আমি।

ওতে লেখা বেলা সাড়ে চারটার রেসে কাম এরর নামে একটি ঘোড়া দৌড়ে জিতেছে। আমার বুকি নিশ্চয় রেগে আগুন হয়ে যাবে দেখে আমি রেসে হাজির হইনি।

হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে এল ব্যাপারটার মাজেজা বুঝতে পেরে। কাম এরর-এর রেস তো আজ নয়, কাল বিকেলে। ঘোড়াটার জেতার খবর আগাম ছেপে দিয়েছে এ পত্রিকা।

কপাল ফুঁড়ে ঘাম বেরুল। পত্রিকাটি ফেলে দিয়েছিলাম। তুলে নিলাম আবার। হাত কাঁপছে আমার বেলা দুটোর রেসে কোন্ ঘোড়া জিতল দেখতে গিয়ে।

এটি একটি কোল্ট। এ ঘোড়ার নামও শুনিনি।

আগামী দিনের খবরের কাগজ নিয়ে অনেক গল্প শুনেছি আমি। কিন্তু এ পত্রিকাটি সেগুলো থেকে আলাদা...

আমার পত্রিকায় আগামী কালের তারিখ লেখা!

স্টেশনের প্রবেশ পথে চলে এলাম। যে লোকটা কাগজ বিক্রি

করেছে, খুঁজছি তাকে। কিন্তু তার কোনও চিহ্ন নেই। ফল বিক্রেতা এক ছোঁড়াকে লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইলাম। এরকম কাউকে তার চোখে পড়েছে কিনা।

'এখানে কোনও হকারকে আজ দেখি নাই, ভাই,' ভুরু কুঁচকে বলল সে। কোনও খবরের কাগজঅলাই আজ পত্রিকা বিক্রি করতে আসে নাই।' আমি চলে এলাম ওখান থেকে।

বলাবাহুল্য সুইসাইড করিনি আমি। বদলে ফিরে এলাম বাড়ি। আগামীকালের পত্রিকার আদ্যোপান্ত চষে ফেললাম। পরদিন বিকেলের রেসের বিজয়ী ঘোড়াগুলো সম্পর্কে নোট টুকে নিলাম কাগজে, স্টক এক্সচেঞ্জের দাম লিখলাম, এমনকী কাল সন্ধ্যায় গ্রেহাউন্ড রেসে কারা কারা জিতছে তাদের খবরও পড়ে ফেললাম অভিভূত বিস্ময়ে।

নাচতে নাচতে বিছানায় গেলাম আমি। আগামীকাল থেকে লসগুলো পূরণ করব আমি। আপনি যদি আগেভাগে জানতে পারেন ছ'টা ঘোড়দৌড়ে কোন্ কোন্ ঘোড়া জিতবে, আপনাকে ঠেকায় কে? একদিনেই তো আপনি আপনার বিনিয়োগকৃত টাকার কয়েকগুণ ঘরে তুলে আনতে পারবেন। এবং তা-ই করলাম আমি।

পরদিন সন্ধ্যায় যথারীতি চলে এলাম টিউব স্টেশনে। একটা ফ্যাসফেসে কণ্ঠ বলল, 'পেপার, স্যার!'

সেই বেঁটে লোকটাই, গালে জড়ানো মাফলার, ক্যাপটা এমনভাবে টেনে নামানো, চোখ দেখা যায় না। তার ঠাণ্ডা আঙুল ঘষা খেল আমার হাতে। লক্ষ করলাম লোকটার কাছে একটাই মাত্র কাগজ।

'আচ্ছা...' বলতে গেলাম আমি, বাধা পেলাম পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে। স্টেশন থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসছিল একজন,

আমাকে ধাক্কা মেরে হনহন করে এগোল সামনে। তাল সামলে পেছন ফিরলাম। নেই কাগজঅলা।

আমি এখন প্রতিটি রেসে জিতি। সেই সঙ্গে আমার স্টক ব্রোকারের কাছ থেকেও প্রচুর টাকা কামাই। কারণ আগেই বলে দিই স্টক এক্সচেঞ্জে কোন্ কোম্পানির দর নামবে, কোন্‌টা উঠবে। রেস শেষে প্রতিদিন সন্ধ্যা ছ'টায় চলে আসি টিউব স্টেশনে, সেদিনের কাগজ কিনতে। এবং প্রতি সন্ধ্যায় মুখে মাফলার পেঁচানো কাগজঅলা বন্ধুটিকে পেয়ে যাই। তার হাতে একটিই মাত্র কাগজ থাকে আমার কাছে বিক্রি করার জন্য।

দ্রুত ধনী হয়ে যাচ্ছি আমি। আবার জেনির পাণিপ্রার্থনা করলাম। যখন ধ্বংসের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম, ভেবেছি ইহজীবনে জেনির সঙ্গে দেখা হবে না আমার।

জেনির বাবা মালদার পার্টি। একমাত্র মেয়েকে মধ্যবিত্ত কারও হাতে তুলে না দেয়ার ব্যাপারে কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে এখন যেহেতু আমার টাকা আছে, তার জামাই হবার দুঃসাহস দেখাতেই পারি। কারণ জানি আমি যদি জেনিকে বিত্ত বৈভবের মধ্যে রাখতে পারি, এ বিয়েতে আপত্তি করবেন না ওর বাবা। আমার এখন জেনির বাবার চেয়েও বেশি টাকা এবং দিন দিন ব্যাংক ব্যালান্স বেড়েই চলেছে, সত্যি বলতে কী, আমি পরিণত হয়েছি টক অভ দা টাউনে। সবার আলোচনার বিষয়বস্তু এখন আমি। কাজেই ওদের বাসায় যেদিন গেলাম, সাদর সম্ভাষণ জানাল পিতা ও কন্যা।

সেন্ট মার্গারেট চ্যাপেল বিয়ের অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য ধার্য করা হলো। সিদ্ধান্ত নিয়েছি সুইটজারল্যান্ডে যাব মধুচন্দ্রিমায়।

টিউব স্টেশনে প্রতিদিন ক্ষুদ্র মানুষটির কাছ থেকে খবরের কাগজ কিনি আমি। এটা এখন রুটিনে দাঁড়িয়ে গেছে। আগে

ভাবতাম জানব লোকটা কে, কোত্থেকে এসেছে, কী তার পরিচয়। তার কাছে শুধু একটিই মাত্র পত্রিকা কেন থাকে এবং আমি স্টেশনে হাজির হওয়া মাত্র কাগজটা কেন সে তুলে দেয় আমার হাতে। কিন্তু লোকটার কাছ থেকে পত্রিকা কেনা এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, এসব নিয়ে একটুও মাথা ঘামাই না।

বিয়ের আগের দিন সিদ্ধান্ত নিলাম আর পত্রিকা কিনব না। স্টক এবং শেয়ারের দৌলতে আজ আমি দেশের শীর্ষস্থানীয় ধনীদের কাতারে। কাল বিকেল আড়াইটায় কোন্ ঘোড়া রেসে জিতবে, এ খবর জানার আমার এখন আর প্রয়োজন নেই।

জেনিকে কাল বিয়ে করছি আমি। এরপর ওই বেঁটে, নোংরা লোকটার স্মৃতি চিরতরে দূর করে দেব মন থেকে। লোকটার ঠাণ্ডা আঙুলের স্পর্শে ভীতিকর শিহরণ থেকে মুক্ত থাকব।

তবু যথারীতি টিউব স্টেশনে হাজির হয়ে গেলাম আমি! না, রেসের কোন্ ঘোড়া জিতবে জেনে আরও টাকা কামাই করতে নয়, কৌতূহল জাগছে পত্রিকায় আমার বিয়ে নিয়ে কী খবর ছেপেছে দেখতে।

লোকটার হাতে যথারীতি সেই একখানাই কাগজ। আমি কাগজটা তার হাত থেকে নিয়েছি, এই প্রথমবার সে আমার দিকে মুখ তুলে চাইল। তার কোটরাগত চোখের রঙ ধূসর, গাল-চাপড়া ভাঙা। সে আজ মাফলার জড়ায়নি মুখে। মুখটা ভয়ঙ্কর মুখোশের মত। আমি নিজের অজান্তে পিছিয়ে গেলাম এক কদম, শিরদাঁড়া বেয়ে নামল ঠাণ্ডা বরফ জল। লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি, মুখে ভৌতিক হাসি ফুটল তার, লম্বা, হাড্ডিসার হাতখানা স্যালুটের ভঙ্গিতে তুলল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। মিশে গেল টিউব স্টেশনের জনতার ভিড়ে।

কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরলাম আমি। তবে ঘরে ঢুকে জোর

করে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে চাইলাম লোকটার চিন্তা। ওকে ভয় পাবার কী আছে? ওর সঙ্গে তো ইহজীবনে দেখা হবে না আমার। কারণ ওর কাছ থেকে আর খবরের কাগজ কিনতে যাচ্ছি না আমি। লোকটা হয়তো জেনে ফেলেছে ব্যাপারটা। তাই স্যালুটের ভঙ্গিতে বিদায় জানিয়েছে আমাকে।

খবরের কাগজ খুললাম। আগ্রহ নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছি। বিয়ে বিষয়ক কোনও খবরই নেই। অথচ বহু সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে আমি এবং জেনি জানিয়েছি কবে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছি দু'জনে।

কাগজের তারিখটা দেখলাম। হ্যাঁ, এটা আগামীকালের খবরের কাগজই। কিন্তু বিয়ে সংক্রান্ত কোনও খবর ছাপেনি।

হঠাৎ প্রথম পাতার একটি খবরে আটকে গেল চোখ।

ঘুমের মধ্যে বরের মৃত্যু হেডলাইনে লেখা।

বুকের মধ্যে ঘোড়ার মত লাফাতে শুরু করল কলজে। দপদপ করতে লাগল কপালের শিরা। রক্তচাপে ফুলে উঠল।

পড়লাম আমি ঘুমের মধ্যে মারা গেছি, আমার চাকর আমাকে দেখেছে চেয়ারে বসে আছি আমি ধোপদুরস্ত পোশাক পরে, হাতে কলম। মৃত্যুর কারণ ধারণা করা হয়েছে হার্ট ফেইলিওর।

তাই আমি এ লেখাটা লিখছি জেগে থাকার জন্য। বিয়ের আর ক'ঘণ্টা বাকি। এটুকু সময়...আমার...জেগে...থাকতে...

মূল গল্প: জন মার্শের 'দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট'।

পিণ্ড

চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আয়। আমার সাহায্যের খুব দরকার। বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। মিস করিস না।

—আবরার চৌধুরী।

কুরিয়ারে আসা চিঠিটির দিকে হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আবরার যখন বলছে, যেতেই হবে আমাকে। ও আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বরিশাল মেডিকেল কলেজ থেকে একই সাথে পাশ করেছি। ও চলে গেল রাজধানীতে। আমার বাড়ি এখানেই। তাই প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করে দিলাম বাড়িতেই। প্রাকটিসের বয়স বেশিদিন না হলেও সার্জন হিসেবে মোটামুটি নাম করে ফেলেছি। বিয়েশাদী করিনি। মা পাত্রী খুঁজছেন। তবে আবরার বিয়ে করেছে মাস কয়েক আগে। খুব মজা করেছি ক'টা দিন ঢাকায়। বড়লোকের একমাত্র ছেলে আবরার বউ নিয়ে ইউরোপে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গেছে জানতাম। ফিরে আসার পর কোনও সমস্যা হয়নি তো? ঢাকায়, ওর বাসায় ফোন করলে কেমন হয়? আমার বাসায় ফোন লাগেনি এখনও। ফ্যাক্স-ফোনের দোকান থেকে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। রিং বাজছে। ধরছে না কেউ। উদ্বিগ্নবোধ করলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম

আজকেই ঢাকাগামী লঞ্চে উঠে পড়ব। আবরার সাগর লঞ্চের কেবিনের টিকেটও পাঠিয়ে দিয়েছে।

পরদিন সকাল ছ'টার দিকে পৌঁছে গেলাম সদরঘাট। আবরার নিজেই এল রিসিভ করতে। শৌখিন ছেলেটাকে ভীষণ বিধ্বস্ত লাগছে। রাত জাগার ক্লান্তির ছাপ চোখের নীচে, চুলগুলো কাকের বাসা।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ব্যাপার খুব খারাপ।' জবাব দিল আবরার। 'গাড়িতে চল। সব খুলে বলছি।'

গাড়িতে যেতে যেতে ঘটনা বলল আবরার। ওর বউ নায়লাকে নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ শেষে, ফ্রান্সের রিভিয়েরা ঘুরে আসছিল। নায়লা বেচারী যে সাঁতার জানে না তা জানত না আবরার। রিভিয়েরার বিখ্যাত সাগর-সৈকতে সাঁতারের ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছে নায়লাকে। লোনা পানি খেয়ে ঢোল হয়ে গিয়েছিল পেট। পাম্প করে বের করতে হয়েছে পানি। নায়লা পরে সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু মাসখানেক আগে পেটের ব্যথায় হঠাৎ অস্থির হয়ে পড়ে নায়লা। ব্যথাটা ক্রমে বেড়েই চলে। আবরার আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করে নায়লার পেটে পিণ্ড'র মত একটা কী জিনিস ফুলে উঠেছে। ডাক্তাররা প্রথমে ভেবেছিল টিউমার। কিন্তু এ কেমন টিউমার যা জায়গা বদল করে!

'জায়গা বদল করে?' আঁতকে উঠলাম আমি।

'তবে আর বলছি কী,' গুঙিয়ে উঠল আবরার। 'এমন জিনিস দেখেছিস কখনও?'

'দেখা দূরে থাক শুনিইনি,' স্বীকার করলাম আমি।

'কিন্তু এটা করে। এক্স-রে রিপোর্ট দেখলেই বুঝতে পারবি।'

আবরারের উত্তরার প্রাসাদোপম বাড়ি নয়, গাড়ি এসে থামল গুলশানের অত্যন্ত দামী একটি প্রাইভেট ক্লিনিকের সামনে।

'এখানে কেন?' অবাক হলাম আমি।

'কিছু মনে করিস না, দোস্ত,' ম্লান চেহারা নিয়ে বলল আবরার, 'তোকে এক্ষুনি কাজে লেগে যেতে হবে।'

'মানে?'

'মানে নায়লা এখানেই আছে গত একমাস ধরে। আমিও বাড়ি যাবার সময় পাচ্ছি না।'

'তোর ফোন নষ্ট নাকি?'

'হতে পারে। বাড়ির খবর আমি রাখি না।'

সরাসরি সার্জারী রুমে আমাকে নিয়ে এল আবরার।

'নায়লা ভাবী কোথায়?' ঘর খালি দেখে জানতে চাইলাম আমি।

'ডাক্তাররা নিয়ে আসবে এখুনি,' জবাব দিল আবরার। 'তার আগে এগুলো দ্যাখ।'

ড্রয়ার খুলে কতগুলো এক্স-রে ফটোগ্রাফ বের করল আবরার, ঠেলে দিল প্যাকেটটা আমার দিকে।

অবিশ্বাস্য!

পিণ্ডই বটে, নীলচে-কালো রঙের পিণ্ড। তবে এরকম আজব পিণ্ড জীবনে দেখিনি আমি। প্রথম ফটোগ্রাফে পিণ্ডটা যেখানে ছিল দ্বিতীয়টাতে দেখা যাচ্ছে আগের জায়গা থেকে অন্তত আট ইঞ্চি ডানে সরে এসেছে ওটা।

'অপারেশন করাসনি?' প্যাকেটের ভেতর ফটোগ্রাফগুলো ঢোকাতে ঢোকাতে বললাম আমি।

'অপারেশন! ঢাকার সবচে' সেরা সার্জন মোস্তাফিজুর রহমানকে দিয়ে অপারেশন করিয়েছি। কিন্তু পেট কেটে ফাঁক

করার পরে পিণ্ডটাকে দেখতে পাননি তিনি।

আমি কিছু বললাম না। চুপচাপ শুনে যাচ্ছি।

'বিদেশে পাঠাতে চেয়েছিলাম। ডাক্তাররা নিষেধ করেছেন। অপারেশনের পরে রোগিণীর অবস্থা এতই খারাপ হয়েছে যে নড়াচড়া করা যাবে না। শেষে তোর কথা মনে পড়ল। সার্জারীতে তোর মত দ্রুত হাত দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। তুই আমাকে বাঁচা, দোস্ত।'

'কিন্তু দ্বিতীয়বার অপারেশনেও যদি সফলতা না আসে?'

'সব খোদার হাতে ছেড়ে দিয়েছি।'

'অত দুশ্চিন্তা করিস না। দেখি কী করতে পারি। আগে কফি আনা। কফি না খেয়ে কাজ করতে পারব না।'

সাথে সাথে গরম কফি আর স্যান্ডউইচ চলে এল।

নাস্তা খাওয়ার মিনিট দশেক পর আবরার আমাকে নিয়ে ঢুকল অপারেশন থিয়েটারে। প্রায় সাথে সাথে স্ট্রেচারে শোয়ানো নায়লাকে নিয়ে এল নার্স। ওকে দেখে রীতিমত চমকে উঠলাম! ফুলের মত সুন্দর মেয়েটার একী দশা! যেন একটা কঙ্কাল শুয়ে আছে।

'নায়লা রক্তশূন্যতায় ভুগছে নাকি!' বিস্মিত গলায় বললাম আমি।

'দেখে মনে হয় তাই,' অন্ধকার মুখে বলল আবরার। 'কেউ যেন রক্ত শুষে নিচ্ছে ওর ভেতর থেকে।'

'তা হলে আমার অপারেশন শেষ হবার সাথে সাথে ওর শরীরে রক্ত দিতে হবে,' বলে গ্লাভস্ পরে নিলাম হাতে। শুরু হলো অপারেশন।

স্কালপেলটা পেটে ছোঁয়াতেই পিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল চোখের সামনে। চাপ দিলাম ওটার গায়ে। আঙুলের নীচে মোচড় খেল জিনিসটা, যেন পেশীবহুল একটা শরীর। পিণ্ড মোচড় খায়? বাপের জনমেও শুনিনি। অ্যানেসথেসিয়াসিস্টের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম। সে অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে জায়গাটা অবশ করে ফেলল।

এরপর আসল কাজ শুরু করে দিলাম। পেটটা কেটে ফেললাম স্কালপেলের একটানে। যেখানে ফুলে আছে পিণ্ড, ঠিক সেখানটায় ঢুকিয়ে দিলাম সুঁই। জিনিসটা ভীষণ পিচ্ছিল, পেটের ওপরের দিকে হড়াৎ করে পিছলে সরে গেল। আমিও বিদ্যুৎ গতিতে ছুরি চালিয়ে গেলাম। অস্ত্র ফাঁক করতেই লাল-কালো রঙের স্পঞ্জের মত একটা জিনিস বেরিয়ে এল, সুঁইয়ে গাঁথা অবস্থায়।

স্পঞ্জটা চিমসে রেখেছে শরীর, হঠাৎ মোচড় খেয়ে ফুলতে শুরু করল ওটা, এক জোড়া চোখ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

একটা অক্টোপাস!

জীবনে অনেক অপারেশন করেছি। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু এমন ভয়ানক অভিজ্ঞতা কোনদিন হয়নি। চোখ দুটো—কী বলব—মনে হলো ক্রূর দৃষ্টিতে নরকের শয়তান তাকিয়ে আছে আমার দিকে। রক্তহিম হয়ে গেল আমার। দেখলাম সুঁইয়ে গাঁথা স্পঞ্জের মত নরম শরীরটা সাপের কুণ্ডলী খোলার মত লিকলিকে কতগুলো শুঁড় মেলে ধরতে শুরু করেছে, চেপে ধরল ফাঁক হয়ে থাকা অস্ত্র, জোঁকের মত লেগে থাকল। যেন শুষে খাচ্ছে রক্ত আর রস। ওটাকে ফরসেপ দিয়ে কীভাবে ছুটিয়ে এনেছি জানি না, পরবর্তী দশ সেকেন্ড সম্ভবত আমার হিতাহিত জ্ঞানও ছিল না, তবে আবরার বলেছে মোচড় খেতে থাকা স্পঞ্জটাকে আমি নাকি কম পক্ষে পঞ্চাশবার ছুরি দিয়ে কুপিয়ে

টুকরো টুকরো করে ফেলেছি। অবিশ্বাস্য ব্যাপার—ছোট, কাটা শুঁড়গুলো তারপরও লাফাচ্ছিল। খণ্ড-বিখণ্ড শরীরের অবশিষ্টাংশ বেসিনে ফেলে দিতে দিতে বললাম, 'এই তোমার পিণ্ড।'

শরীর টুকরো হয়ে গেছে, তারপরও ড্যাবডেবে চোখ মেলে অক্টোপাসটা তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। কী ভয়ঙ্কর!

ঘেন্না আর আতঙ্কে বারবার শিউরে উঠল আবরার। ওদিকে দ্বিতীয়বার ফিরে চাইল না।

দ্রুত গতিতে নায়লার পেট সেলাই করে দিলাম আমি। ও এখনও অজ্ঞান হয়েই আছে।

নায়লা সুস্থ হয়ে উঠল শীঘ্রি। তবে প্রতিজ্ঞা করল জীবনে কোনদিন সমুদ্রের ধারে-কাছে যাবে না।

আর আবরারের চিঠির 'বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে' কথাটার মানেও বুঝতে পারলাম। বলা যায়, হাতে-কলমে প্রমাণ পেলাম। অক্টোপাস অপারেশনের ঘটনা ঢাকার সবগুলো জাতীয় দৈনিকে ছাপা হলো। বলা হলো, সার্জারীর জগতে বিস্ময়কর এক প্রতিভার আগমন ঘটেছে যার অপারেশনের হাত আলোর চেয়েও দ্রুতগতিসম্পন্ন।

বাড়িয়ে বলা হয়েছে কথাটা। তবে ঢাকার বিখ্যাত ক্লিনিকগুলোর লোভনীয় অফার গ্রহণ করতে রাজি হলাম না আমি। অত টাকার দরকার নেই আমার। বরং বরিশালে, আমার বিধবা মা-কে নিয়ে আমাদের ছোট্ট ঘরে থাকতেই বেশি পছন্দ করব আমি।

এডগার জেপসন ও জন গসওয়ার্থের 'দ্য শিফটিং গ্রোথ' অবলম্বনে।

ভয়াল দ্বীপ

ছয়জন স্কাউট লেকের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি সুদূরের ছোট ছোট দ্বীপগুলোর দিকে। লেকের ধারে তিন সপ্তাহ হলো ক্যাম্প করেছে ওরা। আজ রাতে ওদের চূড়ান্ত সারভাইভাল টেস্ট।

'তুমি প্রস্তুত তো, টাই?' ঠাট্টার সুর ফিলের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল টাই। 'আমি আগুন জ্বালাতে পারি, তাঁবু খাটাতেও জানি।'

'ক্যাম্পিং-এ দক্ষতা অর্জন কোনও সমস্যা নয়,' পানিতে চোখ রেখে বলল এরিক।

'সমস্যা হলো একাকীত্ব। এটা পেয়ে বসে অনেককে।'

মোটা কাঁচের চশমার ফাঁক দিয়ে ফিল এবং রাইসের দিকে পালাক্রমে তাকাচ্ছে টাই। ওরা ওকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছে। সবসময়ই করে। কারণ স্কাউট দলের মধ্যে ও সর্বকনিষ্ঠ এবং উচ্চতাও সবার চেয়ে কম।

'ভয়ের কিছু নেই ছেলেরা,' মাঝেখানে কথা বলল মার্ক।

'আমাদের শুধু একটা রাত একা কাটাতে হবে ওই দ্বীপগুলোর একটাতে।'

'ঝামেলা হলে ইমার্জেন্সি ফ্লেয়ার তো সঙ্গে থাকছেই।' বলল ব্রাড। 'ওখানে কিছু ঘটার সম্ভাবনা আছে নাকি?'

এরিক এখনও তাকিয়ে আছে দ্বীপগুলোর দিকে। 'এটা নির্ভর করছে গল্পগুলো সত্য নাকি মিথ্যা তার ওপর।'

'কীসের গল্প?' জিজ্ঞেস করল অ্যালেক্স। টাই-র প্রায় সমবয়সী সে, স্কাউটিংয়ে প্রথম বছর চলছে।

লেক থেকে নজর ফেরাল এরিক, তাকাল ছেলেগুলোর দিকে। মুখে মুচকি হাসি।

'তোমাকে কেউ গল্পটা বলেনি?'

'রহস্য করতে হবে না, এরিক,' দাবড়ে উঠল মার্ক। 'তুমি সবসময় টাইকে ভয় দেখানোর তালে থাক। আর এখন এসব গল্প বানিয়ে বলার সময়ও নয়।'

'ও গল্প বানাচ্ছে না, মার্ক,' নিচু গলায় বলল ফিল। 'গতরাতে মি. কনক্লিড এবং মি. অ্যান্ডারসনকে একই বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুনেছি আমি। গাছের আড়ালে লুকিয়ে আমি আর এরিক শুনে ফেলেছি তাদের গল্পের বিষয়বস্তু।'

'ওরা কী নিয়ে কথা বললেন?' জানতে চাইল মার্ক।

'বললেন ওই দ্বীপগুলোর একটাকে নিয়ে নাকি প্রাচীন কুসংস্কার আছে,' বলল এরিক।

'অদ্ভুত একটা প্রাণী নাকি বাস করে দ্বীপটিতে।'

'ওরা বলে আকার বদলকারী,' জবাব দিল ফিল।

'এর মানে কী?' জানতে চাইল অ্যালেক্স।

'ওয়্যার উলফের মত কোনও প্রাণী, মানুষ থেকে নেকড়েতে যার রূপান্তর ঘটে,' বলল এরিক। 'মি. অ্যান্ডারসন বললেন ওই দ্বীপে নাকি ওয়্যার উলফ আছে বলে শোনা যায়।'

মি. কঙ্কলিন এবং মি. অ্যান্ডারসনকে এগিয়ে আসতে দেখে গলার স্বর নীচে নামাল সে। 'তোমাদেরকে এখন যেতে হবে ছেলেরা,' বললেন মি. কঙ্কলিন, 'জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে

নিয়েছ তো?'

দু'টি ছেলেই মাথা দোলাল।

'কারও কোনও প্রশ্ন আছে?' জিজ্ঞেস করলেন মি. অ্যান্ডারসন। অ্যালেক্স হাত তুলে কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু এরিক এমন কটমট করে ওর দিকে তাকাল, হাত নামিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো ও।

'ঠিক আছে,' বললেন মি. কঙ্কলিন, 'কী কী করতে হবে আরেকবার শুনে নাও। তোমাদেরকে নৌকায় করে ওই দ্বীপগুলোতে নিয়ে যাওয়া হবে। একেকজন একেক দ্বীপে রাত কাটাবে। সকাল পাঁচটা পর্যন্ত একা থাকতে হবে তোমাদেরকে। তোমাদেরকে খাবার, দেশলাই এবং ফার্স্ট এইড দেয়া হয়েছে। আজ রাতে তাঁবুর বদলে স্লীপিং ব্যাগে ঘুমাবে। তোমাদেরকে একজোড়া ইমার্জেন্সি ফ্লেয়ারও দেয়া হয়েছে। খুব জরুরী প্রয়োজন হলে ফ্লেয়ার জ্বালাবে। আমি এবং মি. অ্যান্ডারসন পালাক্রমে আজ রাতে ঘুমাব। কাজেই ফ্লেয়ার জ্বললে দেখতে পাব।'

'তবে একটা কথা, টাই,' মি. কঙ্কলিনের কথা শেষ হলে যোগ করল এরিক। 'ভয় পেয়ে কিন্তু ফ্লেয়ার জ্বালানো যাবে না।'

সবাই এ কথায় নার্ভাস ভঙ্গিতে হেসে উঠল। দুটো রোবোটে যে যার জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়ল। টাই প্রবল ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে থাকল এরিকের দিকে। এরিক খেয়াল করল না ব্যাপারটা।

একটা বোটে মি. অ্যান্ডারসন ফিল, মার্ক এবং ব্রাডকে নিয়ে উঠলেন। আগের বোটে কঙ্কলিনের সঙ্গে এরিক, অ্যালেক্স এবং টাই। পাশাপাশি চলতে লাগল বোট দুটো। গন্তব্য দূরের

দ্বীপপুঞ্জ। একটা সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল দুটো বোট। পরস্পরকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল ছেলেরা।

লেকের বাম দিকের প্রথম দ্বীপটির দিকে বোট নিয়ে এগুলেন কঙ্কলিন, ছোট, উঁচু একটা দ্বীপ। মাঝখানে কতগুলো ফার গাছের সারি। টাই আশা করল মি. কঙ্কলিন এই দ্বীপে ওকে নেমে পড়তে বলবেন, কিন্তু দলনেতার নির্দেশে অ্যালেক্স তার বোঁচকা বুচকি নিয়ে নেমে পড়ল এ দ্বীপে। আবার নৌকা চলতে শুরু করেছে। টাই হাত নেড়ে বিদায় জানাল অ্যালেক্সকে। লক্ষ করল ওর চোখে ভয় ফুটে উঠেছে।

বৈঠা বেয়ে পরের দ্বীপটিতে চলে এলেন মি. কঙ্কলিন। এটি আগের দ্বীপটির চেয়ে বড়, গাছের সংখ্যাও বেশি। গাছের ফাঁক দিয়ে টাই একটা ক্যাম্পিং স্পট দেখতে পেল। অ্যালেক্সের দ্বীপের মত তেমন নিরাপদ মনে হলো না, তবু টাই আশা করল মি. কঙ্কলিন ওকে এ দ্বীপে রাত কাটাতে বলবেন।

'ওকে, টাই, এটি তোমার দ্বীপ,' দ্বীপের কাছে বোট যেতে মি. কঙ্কলিন বললেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বোঁচকার দিকে হাত বাড়িয়েছে টাই, এরিক ধাক্কা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিল।

'আমি এ দ্বীপে যাব, মি. কঙ্কলিন,' টাই'র দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল সে। 'আমি দলের সবার চেয়ে সিনিয়র। কাজেই এ দ্বীপটা আমি চাইতেই পারি।'

বিরক্তি নিয়ে এরিকের দিকে তাকালেন মি. কঙ্কলিন।

'এখানে টাই'র থাকাই ভাল। শেষ দ্বীপটা ওর পছন্দ না-ও হতে পারে।'

এরিক ওর প্যাক এবং স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে নৌকার ওপর সিধে হলো।

বলল, 'তবু এ দ্বীপটাই আমার চাই, মি. কঙ্কলিন,' দলনেতা বাধা দেয়ার আগেই পানিতে লাফিয়ে নেমে পড়ল সে, এগোতে লাগল তীরের দিকে। মি. কঙ্কলিনের ধমক অগ্রাহ্য করে উঠে পড়ল তীরে, ছুটল খোলা ক্যাম্পিং স্পটের দিকে।

মি. কঙ্কলিন তৃতীয় দ্বীপের দিকে নৌকা ঘুরিয়েছেন, ঠাণ্ডা ঘাম ছুটল টাই'র শরীরে। লেকের ওপর ভুতুড়ে ছায়া ফেলেছে দ্বীপটি।

'দুঃখিত, টাই,' বললেন মি. কঙ্কলিন, 'ওই দ্বীপটি এরিকের দখল নেয়া মোটেই উচিত হয়নি। কিন্তু এখন করার কিছু নেই। আশা করি তুমি এ দ্বীপে ভালই থাকবে। প্রয়োজন পড়লে ফ্লেয়ার জ্বেলো।'

টাই লেকের গভীর সবুজ পানির দিকে তাকিয়ে ভাবছে এরিককে সে কতটা ঘৃণা করে। ইচ্ছে করল মি. কঙ্কলিনকে বলে তাকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু তা হলে ছেলেরা তাকে ভীতুর ডিম বলে খ্যাপাবে। ওদের সামনে কোনদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না সে।

প্রকাণ্ড দ্বীপটির দিকে কাছিয়ে গেল বোট। এখানে একটা রাত কাটাতে হবে টাইকে। ঘন জঙ্গল দ্বীপে, কিছু দেখা যায় না। গল্পের সেই দ্বীপটাই এটা নয় তো, শঙ্কিত হয়ে ভাবল টাই। হয়তো এরিক আসল কথাটা জানে। জেনেই আগেভাগে নৌকা থেকে নেমে গেছে।

তীরে এসে ভিড়ল নৌকা। মি. কঙ্কলিন হাত বাড়িয়ে দিলেন টাই'র দিকে; ওকে বোট থেকে নামতে সাহায্য করছেন। তাঁর হাতটা ঠাণ্ডা, কাঁপছে।

'কাল সকাল ছ'টায় তোমাকে নিতে আসব,' বললেন তিনি। 'অ্যান্ড গুড লাক।' চলে গেলেন তিনি নৌকার মুখ

ঘুরিয়ে।

নৌকাটাকে যতক্ষণ দেখা যায়, তীরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল টাই। তারপর ঘুরল। ছায়াঘেরা গাছগুলোর দিকে তাকাল। দ্বীপ থেকে জঙ্গলে যাওয়ার কোনও রাস্তা আছে কিনা খুঁজল। নেই। সবখানে ঘন ঝোপ। ঝোপঝাড় ঠেলে একটা মোটামুটি ফাঁকা জায়গায় চলে এল টাই। জায়গাটা লম্বা ঘাসে বোঝাই।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পশ্চিমে ডুব দিচ্ছে সূর্য। এখানেই ক্যাম্প করতে হবে টাইকে। তবে জায়গাটা পছন্দ হচ্ছে না ওর। ঘন গাছপালা আর ঝোপের মধ্যে কেমন গা ছমছমে, অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার আছে। লম্বা ঘাসের নীচে প্রাণীর হাড়গোড় দেখতে পেল টাই। শিরশির করে উঠল গা।

আগুন জ্বালাতে হবে। জঙ্গলে ঢুকে শুকনো ডালপাতা আর খড়কুটো জোগাড়ে লেগে গেল টাই। হঠাৎ মনে হলো এখানে ও একা নেই। ঠাণ্ডা বরফ জল নামল শিরদাঁড়া বেয়ে। আরেকটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে ক্যাম্প করার জায়গায় চলে এল টাই।

শুকনো লম্বা ঘাস ছিঁড়ে আগুন জ্বালাতে গিয়ে আরও কিছু হাড়গোড় চোখে পড়ল টাই'র। ঘেন্না নিয়ে ওগুলো দূরে ছুঁড়ে ফেলল। ভাবল নতুন ক্যাম্পসাইট খুঁজে বের করবে কিনা। কিন্তু রাত নেমেছে। এখন নতুন ক্যাম্পসাইট খুঁজে বের করার সময় নেই। আগুন জ্বালানো থাকলে হয়তো কোনও প্রাণী ওর ধারে কাছে ঘেঁষার সাহস পাবে না।

আগুনের দাউদাউ শিখা টাইয়ের মনে সাহস যোগাল। অগ্নিকুণ্ডের পাশে টেনে নিয়ে এল স্লীপিং ব্যাগ। পরীক্ষা করে দেখল ফ্লেয়ার জোড়া যথাস্থানে আছে কিনা। আছে। সে অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইল।

শুকনো ডাল পোড়ার শব্দ হচ্ছে। আগুনটা একটু উস্কে দিল টাই। আরও কিছু ডালপালা জোগাড় করা উচিত ছিল। যেটুকু আছে তা দিয়ে সারারাত হয়তো আগুন জ্বালিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু এখন ডালপালা সংগ্রহের প্রশ্নই ওঠে না। আগুনের সামনে থেকে নড়ার সাহস নেই টাইয়ের।

চোখ ভেঙে আসছে ঘুম। এমন সময় ওর পেছনে, গাছের আড়ালে একটা শব্দ হলো। কেউ ঝোপের মাঝ দিয়ে পা টেনে টেনে আসছে। আসছে এদিকেই।

কাঁপা হাতে ব্যাকপ্যাকের ফ্লেয়ার বের করল টাই। ফ্লেয়ারের আলোয় হয়তো প্রাণীটা ছুটে পালাবে। মি. কঙ্কলিন আসার আগ পর্যন্ত হয়তো এটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

টাই এক হাতে দেশলাই, অন্য হাতে ফ্লেয়ার ধরেছে, এমন সময় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ওটা। প্রথমে আঁতকে উঠল টাই। পরে বোকার মত হাসল।

ওর সামনে ভয়াল কোন প্রাণী নয়, দাঁড়িয়ে আছে ওরই মত আরেকজন স্কাউট। একে আগে কখনও দেখেনি টাই। টাই'র দলের সিনিয়র স্কাউটদের মত ইউনিফর্ম ছেলেটার গায়ে।

'আমি ভেবেছি এ দ্বীপে আমি একাই আছি,' টাই'র দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল আগন্তুক। 'তুমি এখানে কী করছ?'

টাই ফ্লেয়ার ফেলে সিধে হলো। গলায় আত্মবিশ্বাস ফুটিয়ে বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। তবে তুমি আমাকে ভয়ানক ভয় পাইয়ে দিয়েছ।'

'তুমি আমাকে কী ভেবেছিলে?' মুচকি হাসল তরুণ।

'আ...আমি জানি না,' বিড়বিড় করল টাই।

'যাকগে, এ ক্যাম্পসাইটটা দু'জনকে শেয়ার করতে হবে,'

নিজের ব্যাকপ্যাকটা মাটিতে নামিয়ে রাখল ছেলেটা।

'গোটা দ্বীপে এই একটি মাত্র জায়গা আছে যেখানে ক্যাম্প করা যায়। ভাল কথা, আমার নাম রজার।' অস্বস্তি নিয়ে হাসল টাই, নিজের পরিচয় দিল।

'তুমি এ কাজ আগে কখনও করেছ?' জিজ্ঞেস করল সে রজারকে। 'মানে দ্বীপে কখনও একা রাত কাটিয়েছ?'

'বহুবার,' জবাব দিল রজার। 'তুমি বোধহয় কাটাওনি।'

'না, এই-ই প্রথম,' স্বীকার করল টাই।

আবার হাসল রজার। আগুনের অপর পাশে বসল স্লীপিংব্যাগ খোলার জন্য। টাই দেখল ব্যাকপ্যাক খুলে সে ছাল ছাড়ানো একটা খরগোশ বের করল।

'এটাকে কোথায় পেলে?' মরা প্রাণীটাকে বিতৃষ্ণা নিয়ে দেখল টাই।

'মেরেছি,' বলল রজার। 'এটা আমাদের স্পেশাল সারভাইভাল টেস্টের একটা অংশ। তুমি শিকার করো না?'

'না,' বলল টাই। 'আমার শিকার করে মাংস খাওয়ার দরকার হয় না। একটা স্যান্ডউইচ এনেছিলাম। কিন্তু ব্যাগ খুলতে গিয়ে ওটা আগুনে পড়ে গেছে।'

'সকাল পর্যন্ত না খেয়ে টিকে থাকতে পারবে তো?' বলল রজার। একটা তীক্ষ্ণ সরু কাঠি ঢোকাল খরগোশের শরীরে। আগুনের ওপর ধরল ওটাকে। ঝলসাচ্ছে। 'তুমি আমার সঙ্গে খেতে পারো।'

টাই আগুনে ঝলসাতে থাকা প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, এর চেয়ে না খেয়ে থাকব তাও ভাল।

'তোমার স্কাউট লিডাররা কই?' রজার জিজ্ঞেস করল।

'লেকের ধারে, বেস ক্যাম্পে,' জবাব দিল টাই।

'তার মানে তুমি এখানে একা?'

'একা থাকারই কথা ছিল,' বলল টাই। 'কিন্তু তুমি এসে পড়লে।'

রজার আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে, খরগোশটাকে এপাশ-ওপাশ করে ঝলসাচ্ছে। টাই দেখল আগুনে ওর চোখ জ্বলছে।

'কী হয়েছে? তুমি ভয়ে কাঁপছ কেন?' টাই'র দিকে মুখ তুলে চাইল রজার।

'কী নিয়ে ভয় পাচ্ছ?'

'কিছু না,' কাঁপা গলায় জবাব দিল টাই। 'আমি ভয় পাইনি।'

এক মুহূর্ত নীরব থাকল রজার, তারপর নিচু গলায় বলল, 'তুমি বোধহয় গল্পটা শোনোনি।'

'কীসের গল্প?' নার্ভাস গলায় জিজ্ঞেস করল টাই, এগিয়ে এল অগ্নিকুণ্ডের দিকে।

'এ দ্বীপের গল্প,' বলল রজার। চারপাশের অন্ধকার জঙ্গলে একবার চোখ বোলাল। 'লোকে বলে এখানে নাকি একটা ওয়্যারউলফ আছে।'

'ওটা তো স্রেফ গল্প,' বলল টাই। 'আমাদের দলের ছেলেরাও গল্পটা জানে।' ও শান্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু গলায় ডেলার মত কী যেন বেধেছে, কর্কশ শোনাল কণ্ঠ।

'তোমার হয়তো ওয়্যারউলফে বিশ্বাস নেই,' বলল রজার। 'তবে এসব গল্প অনেক সময় সত্যি হয়।' হেসে উঠল সে টাইয়ের দিকে তাকিয়ে।

টাই হাসল না। রজারকে তার ভাল লাগছে না। 'এসো, মাংস খাও,' খরগোশের একটা রক্তাক্ত পা ছিঁড়ে এগিয়ে দিল

টাই'র দিকে।

টাই কুঁকড়ে গেল। পেট গোলাচ্ছে। মাংস খণ্ডটা দেখে বমি আসছে। 'আমার খিদে নেই।'

মাংস খেয়ে হাড়টা লম্বা ঘাসের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল রজার। 'কিন্তু আমি এখনও ক্ষুধার্ত,' টাই'র দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'খুব ক্ষুধার্ত।'

গা শিরশির করে উঠল টাই'র। পিছিয়ে গেল ও। ফ্রেয়ার খুঁজল। পেল না। দেখল রজার মাংসের শেষ টুকরোটা গিলে ফেলেছে। লাফিয়ে উঠল সে। তাকাল রুপোর থালার মত চাঁদের দিকে। গলার ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল তার, অনেকটা নেকড়ের ডাকের মত—আউউউউ! ওর চেহারায় পরিবর্তন শুরু হলো। ঠিক তখন টাই বুঝতে পারল কীসের পাল্লায় পড়েছে ও। দৌড়ে পালাতে চাইল সে। পারল না। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রজার। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ঝকঝকে শ্বদন্ত। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিল টাই। পর মুহূর্তে থেমে গেল চিৎকার। এক কামড়ে ওর কণ্ঠনালী ছিঁড়ে নিয়েছে ওয়্যারউলফ।

পরদিন সকালে মি. কঙ্কলিন টাইকে নিয়ে যেতে দ্বীপে এলেন। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলেন না ওকে। শুধু লম্বা ঘাসের নীচে মানুষের কতগুলো রক্তমাখা হাড় চোখে পড়ল।

মূল: জে বি স্ট্যাম্পারের 'আইল্যান্ড অভ ফিয়ার'।

বিড়াল-আতঙ্ক

বাড়িটি বিশাল। সাদা ধবধবে। শান্ত, নিঝুম পরিবেশ। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল আরিফ। ক'টা দিন চমৎকার কাটিয়ে দেয়া যাবে। ওফ, গত একমাসে ঝড় বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে। ঈদ সংখ্যার জন্য গল্প, উপন্যাস আর কবিতা লিখতে লিখতে নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল আরিফ আহমেদের। প্রচণ্ড পরিশ্রম হয়েছে ঠিক, কিন্তু কাজগুলো তো শেষ হয়েছে। এখন দু'হপ্তা ঢাকামুখো হবে না আরিফ। রাঙামাটির নিসর্গের মাঝে নিজেকে মিলিয়ে দেবে। আশা করছে সময়টা ওর জন্য উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

কলিংবেলের শব্দে রফিউল নিজেই দরজা খুলে দিল। আরিফকে দেখে চোখে খুশি ঝিলিক দিল, আলিঙ্গন করল বাল্যবন্ধুকে, বুকের সঙ্গে পিষতে পিষতে বলল, 'দোস্ত, এতদিন পর আমাকে মনে পড়ল!' আরিফ ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সময় পাই না রে, এত কাজ! শ্বাস ফেলার জো নেই।'

রফিউল ওকে ছেড়ে দিল। 'ফোন করলি না কেন? স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম।'

আরিফ হাসতে হাসতে বলল, 'তোদের সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য আগে থেকে কিছু জানাইনি। তোর মায়াবতী বউ রিনা

কোথায়?'

'ও বাথরুমে। আয়, ভেতরে আয়। চল, ওপরে গিয়ে বসি।'

সুটকেস হাতে সিঁড়ি বেয়ে আরিফ ওপরে উঠছে এই সময় কোত্থেকে শয়তানের দূতটা এসে হাজির হলো। একটা বিড়াল। বিশাল, কালো কুচকুচে। আরিফের পায়ের কাছে এসে শরীর ঘষতে লাগল। আরিফ আঁতকে উঠে পেছনে সরে গেল। আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ওকে ধরে ফেলল রফিউল। হাসতে হাসতে বলল, 'স্টপ ইট, লুসি। আউট! আউট!' আরিফের দিকে ফিরল ও। 'লুসিকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আরিফ। ও তোর কোনও ক্ষতি করবে না।'

'তুই তো জানিস বিড়াল টিড়াল আমি একদম দেখতে পারি না। ও-ওটা তোদের পোষা নাকি?'

'হ্যাঁ, রিনার পেয়ারের জিনিস। তুই এখনও বিড়াল ভয় পাস! বিড়ালের ভয় তোর আর গেল না।' অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল রফিউল। আরিফ ওর হাসিতে যোগ দিল না। শুকনো মুখে বন্ধুর পেছন পেছন এগোল।

রাতের খাওয়ার আনন্দই মাটি হয়ে গেল লুসির জন্য। রিনা আরিফের জন্য যত্ন করে চিংড়ি মাছের মালাইকারী, ইলিশের দো পেঁয়াজা আর মুড়িঘণ্ট রেঁধেছিল, কিন্তু মূর্তিমান শয়তানটা সারাক্ষণ টেবিলের নীচে আরিফের ঠিক পায়ের কাছে বসেছিল বলে সে ওর প্রিয় আইটেমগুলোর একটাও ভাল করে মুখে তুলতে পারল না। রিনা বলল, 'কী ব্যাপার, আরিফ ভাই, খাচ্ছেন না কেন? রান্না ভাল হয়নি?'

'না, না। খুব ভাল হয়েছে।' আরিফ তাড়াতাড়ি এক লোকমা ভাত গিলতে গিয়ে বিষম খেল। শয়তানের বাচ্চাটা ওর

প্যান্টের কিনারা চিবাতে শুরু করেছে। ধাঁই করে লাথি কষাল আরিফ। ম্যাঁও করে ছিটকে পড়ল লুসি। টেবিলের নীচে তাকাল আরিফ। খানিকটা দূরে বসে আছে লুসি। একটা থাবা চাটছে। চোখে চোখ পড়ল দুজনের। ধক ধক করে উঠল ওটার চোখ। শিউরে উঠল আরিফ। গুলিয়ে উঠল গা। আর খেতে ইচ্ছে করছে না বলে টেবিল ছাড়ল। ক্লান্তির অজুহাত তুলে নিজের রুমে চলে গেল আরিফ। রফিউল আর রিনার সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছেটা জোর করে গলা টিপে মেরে ফেলল। নরকের শয়তানটা পাশে থাকলে গল্প তো ভাল, মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুবে না ওর।

রুমে ঢুকতেই থমকে গেল আরিফ। দরজার পাশে গুটিসুটি মেরে বসে আছে লুসি। নিরীহ মুখ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রাগে মুখ লাল হয়ে গেল আরিফের। চিৎকার করে কাজের মেয়েটাকে ডাকল ও। দৌড়ে এল খাদিজা। 'কী হইছে, ভাইজান?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল সে।

'ওটাকে দূর কর ওখান থেকে।' আঙুল তুলে দেখাল আরিফ।

'আরে, লুসি আবার এহানে আইল কেমতে,' বলে বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিল খাদিজা। লুসি প্রতিবাদ করল না একটুও, শুধু যাওয়ার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে আরিফের দিকে তাকিয়ে থাকল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দুপুরের আগ পর্যন্ত লুসি আরিফের পায়ে পায়ে থাকল। কয়েকবার লাথি মারল ওকে আরিফ রফিউলদের চোখ বাঁচিয়ে, কিন্তু প্রতিবারই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো টার্গেট। যেন লুসি আগে থেকেই আঁচ করতে পারছিল আক্রমণ আসবে। আরিফ পা তোলার সঙ্গে সঙ্গে

নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়িয়েছে। শুধু দপ করে জ্বলে উঠেছে চোখ জোড়া।

দুপুরে রফিউল আরিফকে নিয়ে ওর জীপে ঘুরতে বেরুল। চমৎকার নিসর্গ আরিফের মন থেকে লুসি বিষয়ক অস্বস্তি একেবারে দূর করে দিল। অনেকদিন পর দুই বন্ধু একত্র হয়ে ফিরে গেল শৈশবে, ডুব দিল কৈশোর আর যৌবনের সোনালি বালুবেলায়, তুলে আনল মণিমুক্তো যে যা পারে। গল্পে গল্পে তরতর করে কেটে গেল সময়। নাড়িতে টান পড়তে মনে পড়ল রিনা ওদের জন্য ফুলকপির বড়া, মুরগীর রোস্ট আর পাঙ্গাস মাছ রেঁধেছে। ভাবতেই জিভে জল এসে গেল দুজনের। জীপ ঘোরাল রফিউল বাড়ির দিকে।

আশ্চর্য হলেও সত্যি খাওয়ার সময় লুসির সাড়া শব্দও পাওয়া গেল না কোথাও। নিশ্চিন্ত মনে পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে খেল আরিফ। একাই মাতিয়ে রাখল বন্ধু এবং বন্ধু পত্নীকে। ওর মজার মজার জোকস শুনে রিনা হাসতে হাসতে আরেকটু হলে চেয়ার উল্টে পড়ে যাচ্ছিল। ঠাট্টার সুরে বলল, 'কী ব্যাপার, আরিফ ভাই? কী দেখে মুড এমন চেঞ্জ হলো? কোনও মায়াবতী আদিবাসীকে চোখে পড়েছে বুঝি?'

চোখ টিপল রফিউল। 'লেখক মানুষ বোঝই তো। ওদের মন বর্ষাকালের মত। এই বৃষ্টি, এই রোদ।'

হা হা করে হেসে উঠল আরিফ। 'বেড়ে বলেছিস, দোস্ত। আমাদের মন বর্ষাকালের মত। হাঃ হাঃ হা। না ভাবী, মায়াবতী টায়াবতী নয়। অনেকদিন পর রফিউলটাকে পেয়ে চুটিয়ে গল্প করেছি আজ। তাই মনটা খুব ফ্রেশ লাগছে।' একটু থেমে ইতস্তত করে বলল, 'রফিউল, তোদের লুসি না কী যেন নাম বিড়ালটার, ওটা কোথায়?' চোখ গোল গোল করে আরিফের

দিকে তাকাল রফিউল।

'কেন রে, তুই তো বিড়াল একদম দেখতে পারিস না। লুসির খবরে কী দরকার?'

'না, মানে এমনি...'

'বুঝলে, রিনা, আরিফ বোধহয় আমাদের লুসির প্রেমে পড়ে গিয়েছে।' চোখ ঠেরে বলল রফিউল।

'কার লুসি দেখতে হবে না।' মুচকি হাসল রিনা। 'তা, আরিফ ভাই, লুসিকে ডাকব নাকি? কাছে পিঠে আছে বোধহয়।'

'না, না,' ভয়ানক চমকে উঠল আরিফ। বলল, 'ওকে ডাকার কোনও দরকার নেই। এমনি জানতে চেয়েছিলাম।' মনে মনে ভাবল আপদটা এখন এখানে হাজির না হলেই বাঁচি।

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় শোবার ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল আরিফ লুসি কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কী না দেখার জন্য। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে, দরজা জানালা ভাল করে আটকে শুয়ে পড়ল ও। টেনশনমুক্ত শরীরে দ্রুত ঘুম নেমে এল।

অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি নিয়ে ঘুম থেকে জেগে গেল আরিফ আহমেদ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা ফুসফুস দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই ওর বুক বসে যায়। দুপুরে জীপে ওভাবে খোলা হাওয়ায় ঘোরাঘুরি করা উচিত হয়নি, ভাবল আরিফ। ওতেই ঠাণ্ডা লেগে গেল কী না কে জানে। হয়তো আর খানিক পর সকাল হয়ে যাবে। আধো ঘুম আধো জাগরণে বাইরের জ্যোৎস্না ভোরের আলো বলে ভ্রম হলো আরিফের। কিছুক্ষণ পরেই খাদিজা চা নিয়ে আসবে ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যেতে থাকল ও।

কিন্তু বুকের একপাশে তীক্ষ্ণ সুচ ফোটার মত একটা ব্যথা আরিফকে পুরোপুরি জাগিয়ে তুলল। ব্যথার জায়গায় আপনাআপনি একটা হাত উঠে এল, স্পর্শ পেল মখমলের মত নরম তবে উষ্ণ একটা জিনিসের। যেন গরম পানির একটা বোতল। কিন্তু ঘুমাবার আগে আরিফ তো কাউকে গরম পানির বোতল দিতে বলেনি। তা হলে? এক মুহূর্ত পরেই তীব্র আতঙ্ক এবং প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা নিয়ে ও আবিষ্কার করল জিনিসটা আর কিছু নয়, সেই বিড়ালটা। গরগর করে মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে ওটার।

ধড়মড় করে উঠে বসল আরিফ, বুকের সঙ্গে লেগে থাকা জিনিসটাকে দু'হাত দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। কিন্তু জোকের মত ওটা লটকেই থাকল গায়ের সঙ্গে। বিড়ালটা ওর জামা ছিঁড়ে চুকচুক করে রক্ত খাচ্ছে বুঝতে পেরে আতঙ্কে জমে গেল আরিফ। শরীরের নীচের দিকে তাকাল। জায়গাটা কালচে লাল রক্তে ভেজা। ভ্যাম্পায়ারটা ধারাল দাঁত আর খুরের মত নখ দিয়ে কখন জামাকাপড় ছিঁড়ে রক্ত চুষতে শুরু করেছে টেরও পায়নি আরিফ। পরনের পায়জামা রক্তে ভিজে সপসপে, বিছানার চাদরটা পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেছে তাজা খুনে।

কোনও মতে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল আরিফ, বুকে ঝোলা শয়তানটাকে নিয়ে। টেনে হিঁচড়ে ওটাকে স্থানচ্যুত করে সজোরে ছুঁড়ে মারল মেঝের ওপর। ধপ করে ওটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। রাগে গোঁ গোঁ করে উঠল। আধো অন্ধকারে ভীষণভাবে জ্বলে উঠল কাঁচের মত চোখ দুটো। পাগল হয়ে গেল যেন আরিফ। বই, চায়ের কাপ, সিগারেটের প্যাকেট, কর্পূর তেলের শিশি যা হাতের কাছে পেল ছুঁড়ে মারল বিড়ালটাকে লক্ষ্য করে। তাড়াতাড়ি ড্রেসিং টেবিলের নীচে

গিয়ে ঢুকল ওটা, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকল আরিফের দিকে। বেডসাইড ল্যাম্পটা টেবিল থেকে তুলে নিল আরিফ, একটানে সকেট থেকে ছুটিয়ে ফেলল কানেকশন, তারপর তাড়া করল লুসিকে। যদি আঘাতটা লুসির গায়ে লাগত সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত সে। কিন্তু বিড়ালের নয়টা প্রাণ এই প্রবাদবাক্য লুসি সত্য বলে নতুন করে প্রমাণ করল। ওর গায়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্রটা ছুঁড়ে মারার আগেই চোখে সর্ষেফুল ফুটল আরিফের। নিস্তেজ হয়ে এল শরীর, জ্ঞান হারাল সে।

পরদিন সকালে চা দিতে এসে আরিফের ঘরের দরজা খুলেই আঁতকে উঠল খাদিজা। বিছানার ওপর পড়ে আছে আরিফ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে শরীর এবং বিছানার চাদর। 'আম্মা গো' বলে ভয়ানক চিৎকার দিল খাদিজা, হাত থেকে চায়ের কাপ ছিটকে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভাঙল। দৌড় দিল সে, যেন ভূতে তাড়া করেছে। রিনা আর রফিউলের ঘরের সামনে এসে দরজায় দমাদম আঘাত করতে লাগল। 'আম্মা, আম্মাগো।' বলে একনাগাড়ে চিৎকার করেই চলল খাদিজা।

ঘণ্টা দুই পরের ঘটনা। ডাক্তার এসে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গেছেন আরিফের ক্ষতস্থানে। বলেছেন প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে বটে তবে ভয়ের কিছু নেই। কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জ্ঞান ফিরে পেয়েই আরিফ চেঁচাতে লাগল লুসিকে মেরে ফেলার জন্য।

'ওটাকে মেরে ফেল! কর্পোরেশনে খবর দাও। না হলে ডুবিয়ে মারো। শয়তানটার বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই।' দুর্বল শরীর নিয়ে চিৎকার করতে করতে গলা ভেঙে ফেলল আরিফ।

রিনা আর রফিউল বারবার ক্ষমা চাইল। কিন্তু পেয়ারের

লুসির প্রতি এত গালিগালাজ সহ্য হলো না রিনার। 'ও তো আপনার তেমন ক্ষতি করেনি,' একটু উষ্মার সঙ্গে বলেই ফেলল সে।

'ক্ষতি?' আরিফ কর্কশ সুরে আবার চেঁচাল। 'আমাকে রক্তে গোসল করিয়ে দিয়েছে হারামজাদী। কে জানে চিরদিনের জন্য শরীরের কোনও নার্ভ অকেজো হয়ে গেছে কী না। আর এটা যদি ক্ষতি না হয়, তা হলে কোন্টা ক্ষতি, শুনি? তোমাদের ওই বিড়ালটা একটা শয়তানের হাড্ডি। হাড়ে হারামজাদী।'

'কিন্তু লুসি তো খুব ভাল। বাচ্চারা ওকে নিয়ে কত দুষ্টুমি করে। কই আজ পর্যন্ত শুনিনি ও কাউকে আঁচড়ে বা কামড়ে দিয়েছে।' সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করল রফিউল।

'ওটা আগে ভাল থাকলেও এখন পাজির পা ঝাড়া হয়েছে,' আরিফ বাধা দিল, 'আমি কর্পোরেশনকে সমস্ত ঘটনা বলব। ওরাই যা ব্যবস্থা নেয়ার নেবে।'

'অসম্ভব! তুই এটা করতে পারিস না, আরিফ।' প্রতিবাদ করল রফিউল। 'লুসি আমাদের পোষা বিড়াল। তা ছাড়া ডাক্তার বলেছেন তোর আঘাত গুরুতর কিছু নয়। শিগ্গিরই সুস্থ হয়ে উঠবি।'

'তোদের কারও কথাই আমি শুনছি না, রফিউল। আমি এক্ষুণি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু যাওয়ার আগে অবশ্যই পুলিশে ফোন করব।'

রিনা প্রায় কেঁদে ফেলল। 'লুসি যে কেন আপনার ওপর চড়াও হলো যদি বুঝতে পারতাম!'

আরিফ উত্তরে কী যেন বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ বেডরুমের কোনার দিকে চোখ পড়তে ভয়ানক আঁতকে উঠল ও। 'ওই যে শয়তানটা ওখানে! আবার এসেছে আমার রক্ত খেতে। যা

শয়তান ভাগ! ভাগ, এখান থেকে!'

লুসিই বটে। কোনায় বসে কী জানি চাটছে আর মৃদু গরগর শব্দ করছে।

'আরে, ও খাচ্ছে কী!' অবাক হলো রিনা। ডাকল লুসিকে। 'লুসি! লুসি! এদিকে এসো! এসো বলছি!' কিন্তু লুসির কানে রিনার কথা গেছে বলে মনে হলো না। সে এক মনে তার কাজ করে যেতে লাগল। অগত্যা রিনাকেই এগুতে হলো।

'আরে, এটা তো ওষুধের বোতল!' রিনা বোতলটা লুসির থাবা থেকে কেড়ে নিল।

'ওটা আমার কর্পূর তেলের বোতল! ওটা আমি ওর গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।' গম্ভীর মুখে বলল আরিফ।

'আপনি কি ওটা বুকে মালিশ করেছেন?' জানতে চাইল রিনা।

এই প্রশ্নে বিস্মিত দেখাল আরিফকে। তবে সহজ গলায় বলল, 'ঠাণ্ডা লাগলে তেলটা বুকে মাখি। আমার ঠাণ্ডার ধাত আছে।'

আরিফকে আরও বিস্মিত করে দিয়ে ওরা দুজনে হাসিতে ফেটে পড়ল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে রিনা বলল, 'তা হলেই হয়েছে! আমাদের লুসির কর্পূর তেল খুব প্রিয়।'

'রিনারও তোর মত ঠাণ্ডার ধাত আছে, বুঝলি?' হাসতে হাসতে চোখ থেকে পানি বেরিয়ে এসেছে রফিউলের, হাতের চেটো দিয়ে পানি মুছে বলল, 'রিনা যখন তেলটা গায়ে মাখে তখন লুসি ওর গা চেটে দেয়। তোর কর্পূর তেলের গন্ধেই লুসি আকৃষ্ট হয়েছিল। আর অভ্যাস বশে তোর বুক চেটেছে। অথচ তুই কী না বেচারীকে ভ্যাম্পায়ার ট্যাম্পায়ার আরও কত কী বলে অযথা গালি গালাজ করলি।'

থমথমে হয়ে উঠল আরিফের মুখ। বরফ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তোমাদের ব্যাখ্যা নিয়ে তোমরা যদি সন্তুষ্ট থাকো, তা হলে আমার কিছু বলার নেই। এখন দয়া করে শয়তানটাকে আমার চোখের সামনে থেকে দূর করো। আমি এখন পোশাক পাল্টাব। তোমাদের বাসায় আমার আর এক সেকেন্ডও থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

তারপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। আরিফ আহমেদ এখন প্রায় ভুলে গেছে লুসির স্মৃতি। কিন্তু লুসি কোনওদিন জানতে পারেনি সেই রাতে প্রতিশোধের বাসনায় অল্প সময়ের জন্য সত্যি সত্যি সে পরিণত হয়েছিল রক্তচোষা এক ভ্যাম্পায়ারে।

মূল: মাইকেল ও মলি হার্ডউইকের 'দ্য ম্যান হু হেটেড ক্যাটস' অবলম্বনে।

বানরের প্রতিহিংসা

আমি ঠিক নিশ্চিত নই গতরাতে সত্যি কুকুরের ডাক শুনেছি, নাকি ওটা স্বপ্ন ছিল। আমার কটেজের নীচে, পাহাড়ে ঘেউ ঘেউ করছিল কুকুরগুলো। একটা সোনালি ককার, একটা রিট্রিভার, একটা কালো ল্যাব্রাডর, একটা ডুশন্ড এবং আরও দুটো অচেনা জাতের কুকুর। মাঝরাতের পরে ওদের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় আমার। এমন জোরে ডাকাডাকি করছিল, বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে আসি আমি। তাকাই খোলা জানালা দিয়ে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম ওগুলোকে। পাঁচ-ছ'টা কুকুর। লম্বা ঘাসের মধ্যে ছোটাছুটি করছিল।

অতগুলো ভিন্ন জাতের কুকুর দেখে আমি খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। মাত্র হপ্তাখানেক আগে এ কটেজে উঠেছি। পড়শীদের সঙ্গে দেখা হলে হাই-হ্যালো বলি। আমার প্রতিবেশী ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্নেল ফ্যানশ একটি ককার পোষেণ। তবে ওটার রঙ কালো। আরেক প্রতিবেশী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ দম্পতির কোনও কুকুর নেই। তাঁরা বিড়াল পোষেণ। দুধঅলার আছে একজোড়া মংগ্রেল বা বর্ণসঙ্কর কুকুর। এবং পাঞ্জাবি শিল্পপতি, যিনি এক সাবেক রাজকুমারের প্রাসাদ কিনেছেন, তবে সেখানে থাকেন না—বাড়ি

দেখাশোনা করে তাঁর এক দারোয়ান–সেই দারোয়ান বিশালদেহী তিব্বতি ম্যাস্টিফ কুকুর পুষছে।

গতরাতে দেখা কুকুরগুলোর একটির সঙ্গেও এসব কুকুরের কোনও মিল নেই।

'এখানে কেউ রিট্রিভার পোষে?' সান্ধ্যকালীন ভ্রমণে কর্নেল ফ্যানশ'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে প্রশ্নটা করে বসলাম তাঁকে।

'এমন কারও খবর আমার জানা নেই,' জবাব দিলেন তিনি। ঝোপের মত ভুরুর নীচে অন্তর্ভেদী চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন আমাকে। 'কেন, এমন কোনও জানোয়ার কী চোখে পড়েছে?'

'না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম আর কী। এ এলাকায় প্রচুর কুকুর আছে, না?'

'হুঁ। প্রায় সবাই-ই কুকুর পোষেণ। তবে প্রায়ই প্যান্থারের হামলার শিকার হয় জানোয়ারগুলো। গত শীতে আমি চমৎকার একটি টেরিয়ার হারিয়েছি।'

লম্বা, লালমুখো কর্নেল ফ্যানশ অপেক্ষা করতে লাগলেন আমি তাঁকে আর কিছু বলি কিনা–নাকি চড়াই বেয়ে উঠে হাঁপিয়ে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

ওই রাতে আবারও কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম আমি। জানালার ধারে গিয়ে তাকালাম বাইরে। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে, রুপোলি আলোয় চকচক করছে ওকগাছের পাতা।

কুকুরের দল গাছের দিকে তাকাল মুখ তুলে, ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। কিন্তু গাছে কিছু চোখে পড়ল না আমার। এমনকী একটা পেঁচা পর্যন্ত নয়।

আমি কুকুরগুলোকে একটা দাবড়ানি দিলাম। জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

পরদিন কর্নেল ফ্যানশ-র সঙ্গে দেখা হলে আমার দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকালেন। আমার ধারণা কুকুরগুলো সম্পর্কে তিনি জানেন; কিন্তু আমি কী বলি তা শুনতে চাইছেন। আমি তাঁকে ঘটনাটা খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিলাম।

'কাল মাঝরাতে বেশ কয়েকটা কুকুর দেখেছি আমি,' বললাম আমি। 'একটা ককার, একটা রিট্রিভার, একটা পেক, একটা ডুশন্ড এবং একজোড়া মংগ্রেল। এখন, কর্নেল, বলুন ওরা আসলে কী?'

কর্নেলের চোখ জ্বলে উঠল। 'আপনি মিস ফেয়ারচাইল্ডের কুকুরদের দেখেছেন।'

'অঃ। তিনি থাকেন কোথায়?'

'তিনি কোথাও থাকেন না, মাই বয়। তিনি পনেরো বছর আগে মারা গেছেন।'

'তা হলে তাঁর কুকুরগুলো এখানে কী করছে?'

'বানরের খোঁজ করছে,' জবাব দিলেন কর্নেল। আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

'ঠিক বুঝলাম না।'

'ব্যাখ্যা করছি,' বললেন কর্নেল। 'তার আগে বলুন আপনি ভূত বিশ্বাস করেন কিনা।'

'ভূত-টূত কখনও চোখে পড়েনি।'

'চোখে পড়েছে, মাই বয়, আপনি ভূত দেখেছেন। মিস ফেয়ারচাইল্ডের কুকুরগুলো ক'বছর আগে মারা গেছে–একটা ককার, একটা রিট্রিভার, একটা জশুন্ড, একটা পেক এবং একজোড়া মংগ্রেল; ওক গাছের নীচে, ছোট একটা টিলায় ওগুলোকে কবর দেয়া হয়েছে। তবে ওদের মৃত্যু অস্বাভাবিক ছিল না। সব ক'টা বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তাদের

মনিবানীর মৃত্যু শোকও সইতে পারেনি বেশিদিন। মিস ফেয়ারচাইল্ডের মৃত্যুর পরে প্রতিবেশীরাই কুকুরগুলোর দেখাশোনা করত।'

'এবং আমি যে কটেজে থাকি সেখানে মিস ফেয়ারচাইল্ড থাকতেন? তিনি কি তরুণী ছিলেন?'

'তাঁর বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশের কোঠায়, সুগঠিত শরীরের অধিকারিণী। বেড়াতে খুব ভালবাসতেন। পুরুষদেরকে তেমন পাত্তা দিতেন না। আমি ভেবেছি আপনি ওঁর কথা জানেন।'

'না, জানি না। আমি এখানে এসেছি অল্প ক'দিন, জানেনই তো। কিন্তু বানর নিয়ে কী যেন বলছিলেন? কুকুরগুলো বানর খুঁজবে কেন?'

'ওটাই এ গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ। লম্বা লেজঅলা লেঙ্গুর বাঁদর কখনও চোখে পড়েছে আপনার? ওকের পাতা খেতে আসে।'

'না।'

'চোখে পড়বে। আজ হোক বা কাল হোক। এখানকার জঙ্গলে এ বানরগুলো দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এমনিতে কারও ক্ষতি করে না, তবে সুযোগ পেলে বাগানে ঢুকে সাবড়ে দেয় যাবতীয় ফলমূল... তো, মিস ফেয়ারচাইল্ড এ বানরগুলো দু'চোখে দেখতে পারতেন না। ডালিয়া ফুল খুব ভালবাসতেন তিনি। নিজের বাগানে বিরল প্রজাতির কিছু ডালিয়ার চাষ করেছিলেন মিস ফেয়ারচাইল্ড। একরাতে একদল বানর এসে তাঁর বাগানের সবগুলো ডালিয়ার কুঁড়ি খেয়ে ফেলে। রাগে উন্মাদ হয়ে যান মিস ফেয়ারচাইল্ড। যাঁরা বাগান করেন, তাঁদের প্রিয় ফুলের গাছ ধ্বংস হয়ে গেলে উন্মাদ হবারই কথা। মিস ফেয়ারচাইল্ড এরপর থেকে বাগানে তাঁর কুকুরগুলোকে

পাহারায় বসান। বানর দেখলেই তিনি পোষা জানোয়ারদের ওগুলোর পেছনে লেলিয়ে দিতেন। এমনকী মধ্যরাতেও। তবে বানরদের কোনও ক্ষতি করতে পারত না কুকুরের দল। বানররা তরতর করে গাছে উঠে পড়ত। কুকুরগুলো গাছের নীচে ঘেউ ঘেউ করত।

'তারপর একদিন—না, দিনে নয়, রাতে—প্রতিশোধের বাসনায় শটগান নিয়ে জানালার ধারে বসে পড়েন মিস ফেয়ারচাইল্ড। বানরগুলো বাগানের কাছে আসা মাত্র একটাকে গুলি করে মেরে ফেলেন।'

বিরতি দিলেন কর্নেল। তাকালেন ওক গাছের দিকে। বিকেলের উষ্ণ আলোয় ঝলমল করছে গাছগুলো।

'কাজটা তাঁর করা উচিত হয়নি,' বললেন তিনি।

'বানরদের গুলি করা কারও উচিত নয়। এরা হিন্দুদের কাছে দেবতার মত পূজনীয় বলেই নয়—ওদের সঙ্গে মানুষের তো অনেক মিল আছে। যাকগে, আজ যাই। একটু কাজ আছে।' আকস্মিক গল্পে উপসংহার টেনে দিলেন কর্নেল, লম্বা পা ফেলে দেবদারু গাছগুলোর আড়ালে চলে গেলেন।

সে রাতে কুকুরের চিৎকার কানে এল না আমার। তবে পরদিন বানর দেখতে পেলাম—সত্যিকারের বানর, ভূত নয়। বুড়ো ধাড়ি-জোয়ান মিলে সংখ্যায় কমপক্ষে কুড়ি জন হবে। গাছে বসে ওক পাতা চিবুচ্ছে। আমাকে গ্রাহ্য করল না ওরা। আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে।

বানরগুলো দেখতে খারাপ নয়। গায়ের লোম রূপোলি-ধূসর, লেজ লম্বা, সাপের মত। স্বচ্ছন্দে এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফাচ্ছে ওরা, পরস্পরের প্রতি বিনীত, ভদ্র আচরণ—সমভূমির লাল বানরগুলোর মত অভব্য নয়। ছোট

বানরগুলো পাহাড়ের নীচে ছোটাছুটি করছে, খেলছে, কুস্তি লড়ছে স্কুলছাত্রদের মত।

ওদেরকে ধাওয়া করার মত কোনও কুকুর নেই—প্রলুব্ধ করার মত ডালিয়াও নেই।

ওই রাতে আবার কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম। আগের চেয়ে উত্তেজিত হয়ে ডাকাডাকি করছে।

'এবারে আর বিছানা ছেড়ে উঠছি না আমি,' বিড়বিড় করে কম্বলটা টেনে দিলাম মাথার ওপরে।

কিন্তু চিৎকার-চেঁচামেচি ক্রমে জোরাল হয়ে উঠল, এর সঙ্গে যোগ হলো আরেকটি কণ্ঠ। কিচকিচ করছে কেউ।

হঠাৎ নারী কণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল জঙ্গল থেকে। এমন ভয়ংকর চিৎকার, ঘাড়ের পিছনের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

আমি লাফ মেরে বিছানা ছাড়লাম। ছুটে গেলাম জানালার ধারে।

এক মহিলা চিৎ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, তিন/চারটা প্রকাণ্ডদেহী বানর তার শরীরে চড়ে বসেছে। তারা মহিলার হাত কামড়ে মাংস তুলে নিচ্ছে, একজন কামড়ে ধরল গলা। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে, চেষ্টা করছে বানরগুলোকে তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু পারছে না। পেছন থেকে আরও কয়েকটা বানর তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। মহিলার কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না কুকুরগুলোকে। মহিলা আবার রক্ত হিম করা আর্তনাদ ছাড়ল। আমি লাফ মেরে ঘরে চলে এলাম। ছোট কুঠারটি নিয়ে ছুটলাম বাগানে।

কিন্তু সবাই—কুকুর, বানর আর রক্তাক্ত মহিলা পর্যন্ত অদৃশ্য। আমি হাতে কুঠার নিয়ে, খালি গায়ে পাহাড়ের নীচে

বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকলাম।

পরদিন ঠাট্টার সুরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল, 'এখনও রাতে কুকুরগুলোকে দেখেন নাকি?'

'শুধু কুকুর নয়, বানরও দেখেছি,' জবাব দিলাম আমি।

'হ্যাঁ, ওগুলো মাঝে মাঝে আসে এদিকে। তবে কারও ক্ষতিটতি করে না।'

'জানি—তবে গতরাতে কুকুরগুলোর সঙ্গে দেখেছি ওদেরকে।'

'তাই নাকি? অদ্ভুত ব্যাপার তো, খুবই অদ্ভুত।'

কর্নেল অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। তবে আমার কথা শেষ হয়নি তখনও।

'কর্নেল,' বললাম আমি, 'আপনি কিন্তু আমাকে বলেননি মিস ফেয়ারচাইল্ড কীভাবে মারা গেছেন।'

'বলিনি বুঝি? বোধহয় মনে ছিল না। বয়স হয়ে যাচ্ছে তো, অনেক কিছুই মনে থাকে না। তবে মিস ফেয়ারচাইল্ডের মৃত্যুর কথা মনে আছে আমার। বেচারী, বানরগুলো তাঁকে হত্যা করে। স্রেফ টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল মহিলাকে...'

কর্নেলের কণ্ঠ ক্রমে নিচু হয়ে আসে, তিনি একটা কেন্নোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর হাতের ছড়ি বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে প্রাণীটা।

'ওদেরকে গুলি করা উচিত হয়নি তাঁর,' বলেন তিনি, 'বানরকে গুলি করা কারোরই উচিত নয়—ওরা তো মানুষের মতই, আপনি জানেন...'

মূল গল্প: রাসকিন বন্ডের 'দ্য মাঙ্কিজ'।

কণ্ঠ

আমার সবচে' প্রিয় বন্ধু মাহবুবের কিছু একটা হয়েছে। অনেক দিন ধরেই দেখছি সব সময় অন্ধকার করে রাখে মুখ। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ পরিষ্কার। প্রশ্ন করলে 'কিছু হয়নি' বলে এড়িয়ে যায়। কিন্তু ও যে বড় ধরনের কোনও সমস্যায় পড়েছে তা আচার-আচরণ দেখে বোঝা যায়। মাহবুবকে শেষ কবে হাসতে দেখেছি মনে পড়ে না আমার। সেদিন ইংরেজীর ক্লাসে ওকে চেহারা আরও ম্লান করে ঢুকতে দেখলাম। আমার পাশের ডেস্কে বসল। তারপর ভীষণ করুণ মুখ করে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। আমাকে গ্রাহ্যই করল না।

খুব রাগ হলো আমার। নোট খাতা থেকে এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে লিখলাম, 'কীরে চেহারাটা অমন করে রেখেছিস কেন? মনে হচ্ছে তোর কেউ মরেছে।'

কাগজটা মাহবুবের ডেস্কে রেখে কনুই দিয়ে মৃদু গুঁতো দিলাম। লাফিয়ে উঠল। ইঙ্গিতে কাগজের টুকরোটা দেখালাম। লেখাটা পড়ল ও। তারপর আমার দিকে চাইল মুখ তুলে। ভীত-বিহ্বল দৃষ্টি। বুকটা ধক করে উঠল আমার।

ঠিক ওই সময় আমাদের ইংরেজীর টিচার মি. রাইয়ান মাহমুদ ডাক দিলেন আমাকে। এডগার অ্যালান পো-র 'দ্য

র‍্যাভেন' আবৃত্তি করে শোনাতে বলছেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। শুরু করলাম আবৃত্তি। পো-র এই কবিতাটি বেশ প্রিয় আমার। কিন্তু আজ কেন জানি গা-টা ছমছম করে উঠল কবিতা পড়ার সময়।

প্রথম স্তবক পড়ার পর রাইয়ান সার আরেকজনকে দ্বিতীয় স্তবক পড়তে বললেন। আমি বসে পড়লাম ডেস্কে। তাকালাম মাহবুবের দিকে। আমাকে একটা কাগজ এগিয়ে দিল ও সারের চোখ বাঁচিয়ে।

ভাঁজ খুলে মেলে ধরলাম কাগজটি। একটি মাত্র বাক্য লেখা: *ভয়ানক একটি দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে।*

সরাসরি চাইলাম মাহবুবের দিকে। ওর মায়াবী চোখে ফুটে আছে ভয়। আবার চিরকুটের দিকে নজর ফেরালাম। আবার লেখাটা পড়লাম। কোনও প্রশ্ন বা অনুমান নয়, মাহবুব পরিষ্কার বলে দিচ্ছে একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে। বুঝতে পারলাম না এ লেখার মানে কী।

আরেকটা কাগজ ছিঁড়ে লিখলাম, 'তোর মাথা ঠিক আছে তো?' কাগজটা মুড়ে চালান করে দিলাম মাহবুবের ডেস্কে।

লেখাটা পড়ে ঠোঁট কামড়াল মাহবুব। সাথে সাথে আরেকটা কাগজে দ্রুত কী যেন লিখে ফেলল। তারপর ওটা ঠেলে দিল আমার ডেস্কে। আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

কাঁপা হাতে কাগজটা খুললাম আমি। 'দেখতেই পাবে' লেখা চিরকুটে।

সেদিন মাহবুবের সাথে স্কুলে আর কথা হলো না। ওকে খুঁজে পেলাম না কোথাও। আরেক বন্ধুর সাথে ফিরে এলাম বাড়ি। রাতে একবার ভাবলাম ফোন করি মাহবুবকে। কিন্তু ও আমাকে বার বার এড়িয়ে চলছে মনে পড়তেই রাগ হলো। চলে

গেল ফোন করার ইচ্ছে।

'পরদিন সকালে দেখা হয়ে গেল মাহবুবের সাথে ইংরেজীর ক্লাসে ঢোকার সময়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। শূন্য দৃষ্টি চোখে। একটু পরে ইংরেজীর টিচার এলেন। তবে রাইয়ান সার নন, অন্য আরেকজন।

আমার পেছনে বসেছে মাহবুব। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'রাইয়ান সার আর তাঁর স্ত্রী কাল রাতে কার অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। দু'জনেই মারাত্মক আহত। শুনেছি রাইয়ান সার অনেক দিন ক্লাস নিতে পারবেন না।'

রাইয়ান সারের জন্য খুব কষ্ট হলো আমার। মাত্র গত বছর বিয়ে করেছেন ভদ্রলোক। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে হিম একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম মাহবুবের দিকে। ওর চোখ ঝকঝক করে জ্বলছে দামী পাথরের মত। বাঁকা হাসি ঠোঁটে। 'দেখলি তো আমি মিথ্যা বলিনি,' ফিসফিস করল মাহবুব।

ওর ঝকঝকে চোখের চাউনি সহ্য হলো না আমার, নামিয়ে নিলাম চোখ। ভাবতে কষ্ট হলো এই আমার বাল্য বন্ধু মাহবুব। যার সাথে কেজি থেকে পড়ছি স্কুলে। রাইয়ান সারের জন্যে ওর একটুও কষ্ট হচ্ছে না? সেই কথাটা মনে পড়ে গেল আবার। কাল রাতেই না মাহবুব চিরকুটে অ্যাক্সিডেন্টের কথা লিখেছিল? হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম আমি। সারাটা ক্লাসে একবারও মাহবুবের দিকে চাইতে পারলাম না চোখ তুলে। ঘণ্টা পড়তে ওর আগে বেরিয়ে পড়লাম ক্লাস থেকে। আমার মনে তখন একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে—যে করেই হোক মাহবুব অ্যাক্সিডেন্টের কথা আগেভাগে জেনে ফেলেছিল। সেদিন আর অন্য ক্লাসও করতে ইচ্ছে করল না। এতটাই

অস্বস্তিবোধ করছিলাম আমি।

মাহবুবকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও পারলাম না। বাসে ওঠার জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, দৌড়াতে দৌড়াতে এল ও। ওকে দেখে কেটে পড়ার তাল করছিলাম, হাত তুলে থামিয়ে দিল।

'দাঁড়া,' চেঁচাল মাহবুব। 'কথা আছে তোর সাথে।'

দাঁড়িয়ে থাকলাম। হাঁপাচ্ছে মাহবুব। ঘাম ফুটেছে মুখে। 'তোকে ক্লাসে খুঁজে না পেয়ে ভাবলাম বাস স্টপেজে যাই,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মাহবুব। 'বাসায় যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ,' ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলাম আমি।

'আজ রাতে কোথাও বেরুচ্ছিস না তো?' জানতে চাইল মাহবুব।

'কোথাও বেরুচ্ছি না। কেন?'

'না বেরুনোই ভাল।' আমাকে লাইন থেকে বের করে আনল মাহবুব। কানের কাছে মুখ এনে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বলল, 'আজ রাতে ভয়ানক এক অগ্নিকাণ্ড ঘটবে।'

অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। কথা বলার সময় কেঁপে গেল গলা। 'কে লাগাবে আগুন—তুই?'

মাহবুবের মুখটা হঠাৎ বাঁকা হয়ে গেল, যেন ভেতরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

'ওরা আমাকে শুধু বলেছে আগুন লাগবে,' হিসিয়ে উঠল ও। 'কে লাগাবে জানি না।' চট করে রাগ উঠে গেল মাথায়। ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। 'কী বলছিস, মাহবুব?' ওর ঠাণ্ডা ঝকঝকে চোখে চোখ রাখলাম আমি। 'এসব ভয়ঙ্কর কথা কে বলে তোকে?'

মাহবুব কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ঝাঁকি মেরে মুক্ত করল নিজেকে। তারপর দৌড় দিল রাস্তার দিকে। ফিরেও চাইল না। বাড়ি

ফেরার পথে সারাক্ষণ ভাবলাম কী করা উচিত আমার। বাবা-মাকে বলে দেব নাকি স্কুলের প্রিন্সিপাল সারকে জানাব? কিন্তু কেউ যদি বিশ্বাস না করে আমার কথা?

সে রাতে এগারোটা পর্যন্ত থাকলাম টেবিলে। আমার চাচাত ভাই সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। যাইনি। সোশাল স্টাডিজের ওপর একটা নোট লিখলাম। নীচ তলায়, ড্রইং রুম থেকে টিভির আওয়াজ ভেসে আসছে। হঠাৎ চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেলাম। ব্যাপার কী জানার জন্য এক দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নীচে। টিভিতে খবর হচ্ছে। যা দেখলাম তাতে হিম হয়ে গেল বুক।

চাচাত ভাই বলাকায় ছবি দেখাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল আমাকে। সেই হলেই আগুন ধরে গেছে। একুশে টিভির এগারোটার খবরে সেই ঘটনাই বিস্তৃত দেখাচ্ছে।

খবর দেখে অসুস্থ, বমি বমি ভাবটা আবার ফিরে এল। আরেকবার ঘটনাটা ঘটেছে। যে করেই হোক মাহবুব আগে জানতে পেরেছে অগ্নিকাণ্ডের কথা। ও বলেছিল আজ রাতে কোথাও আগুন লাগবে।

তক্ষুণি ফোন করলাম মাহবুবের বাড়িতে। ওর মা বললেন হঠাৎ করে মাহবুবের জ্বর এসেছে। জ্বরে কী সব আবোল-তাবোল বকছে। আমি মাহবুবের মাকে দু'একটা সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়ে রেখে দিলাম ফোন।

পরদিন স্কুলে এল না মাহবুব। স্কুলের সবাই উত্তেজিত হয়ে বলাকা হল-এর অগ্নিকাণ্ডের কথা বলছিল। আমাদের স্কুলের একটি ছেলে জনতার হুড়োহুড়িতে আহত হয়েছে। তবে সিনেমা হল-এর খুব বেশি ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। হল কর্মচারীরা ফায়ার এক্সটিং-গুইশার দিয়ে নিভিয়ে ফেলেছে আগুন। তবে

অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা সম্ভব হয়নি।

ক্লাসটা আমার কাটল অদ্ভুত ঘোরের মাঝে। খুব ইচ্ছে করছিল মাহবুবের গোপন কথাটা বলে দিই কাউকে। কিন্তু আদৌ কি কেউ বিশ্বাস করবে এ কথা? শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম মাকে জানাব।

বাসায় ঢুকতে না ঢুকতেই উদ্বিগ্ন মুখে মা বলল, 'মাহবুবের মা ফোন করেছিলেন। মাহবুবের অবস্থা খুবই খারাপ। হাসপাতালে নিয়ে গেছে। মাহবুব নাকি বারবার তোর কথা বলছিল।'

কথাটা শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। মাহবুবের জন্যে যা খুশি করতে পারতাম আমি। কিন্তু এখন ভয় করছে ওর কথা শুনে।

মাহবুবদের সাথে আমাদের একটা পারিবারিক সম্পর্ক আছে। তাই মা-ই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে। রাস্তায় কোনও কথা বললাম না দু'জনে। সারাক্ষণ ভাবছিলাম মাহবুব কি ওর গোপন কথাগুলো বলার জন্যেই আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছে? এরপর কী করব আমি?

মাহবুবের কেবিনে ঢুকলাম। টের পেলাম বুকের ভেতর দমাদম পিটছে হৃৎপিণ্ড। মাহবুবের চেহারা থেকে রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ। তবে চোখ জোড়া জ্বলছে। আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করলাম মণির ভেতরে লাল টকটকে দু'টি বিন্দু রুবির মত জ্বলজ্বল করছে।

আমাকে দেখে ফ্যাকাসে হাসল মাহবুব। আমার মা ওর দিকে এগিয়ে গেল। 'কেমন আছ, বাবা,' বলতে বলতে। মাহবুব দুর্বল গলায় বলল, 'ফয়সালের সাথে একটু কথা বলব, আন্টি। আপনারা যদি

মাহবুবের মা ছেলের শিয়রে বসে ছিলেন। কাঁদছিলেন। এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চলেন, আপা। আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। মাহবুবটা তখন থেকে ফয়সাল! ফয়সাল! করছে।'

মা কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। আমি মাহবুবের মাথার কাছে বসলাম। মাহবুব আমার মাথাটা ধরল দু'হাত দিয়ে, টেনে নিল ওর মুখের ওপর।

'ওরা বলেছে আমি আর বাঁচব না,' ফিসফিস করল মাহবুব।

'ডাক্তাররা বলেছেন?' ভীরু গলায় জানতে চাইলাম আমি, ওর চোখের দিকে চাইতে ভয় লাগছে।

'না, কণ্ঠগুলো,' বলল মাহবুব। 'কণ্ঠগুলো বলেছে আমি মারা যাব...খুব শীঘ্রি।'

ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেছে আমার, ইচ্ছে করল এক ছুটে পালিয়ে যাই। কিন্তু মাহবুব আমার সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওকে এভাবে রেখে যাই কী করে? ওকে আমার সাহায্য করা দরকার।

'কোনও কণ্ঠ তুই শুনতে পাসনি, মাহবুব,' ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। 'আর চিন্তা করিস না। শীঘ্রি ভাল হয়ে উঠবি তুই।'

সিধে হয়ে বসলাম আমি। মাহবুবের ম্লান চেহারায় যন্ত্রণাকাতর হাসির সাথে ফুটে আছে ভয়ার্ত একটা ভাব।

'আমি পাগল নই,' ফিসফিস করল মাহবুব। 'ওরা সারাক্ষণ আমার সাথে কথা বলে। কণ্ঠগুলো কথা বলে।'

হঠাৎ আমার ঘাড় চেপে ধরল মাহবুব, ওর মাথার কাছে নিয়ে এল মাথা। হিসিয়ে উঠল, 'শোন্!'

চিৎকার করে উঠলাম আমি। এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে। ওর দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, দেখি তৃপ্তির হাসি হেসে চোখ বুজল মাহবুব। কণ্ঠগুলো আমাকে বলেছে আমি এখানে যেন বসে থাকি, বিদায় জানাই মাহবুবকে। কারণ ওর সাথে আমার আর দেখা হবে না। আমার ইচ্ছে করল দৌড়ে পালাই। তা হলে সব কিছুর হাত থেকে রক্ষা পাব। কিন্তু কেউ যেন মেঝের সাথে আমার পা পেরেক দিয়ে গেঁথে রেখেছে। নড়তে পারলাম না একচুল।

ভুল ভেবেছিলাম আমি। ওই কণ্ঠগুলো আমার সাথেই আছে। গত দুই মাস ধরে কথা বলছে আমার সঙ্গে। ভয় পাচ্ছি আমি। কারণ ওরা যা বলছে বাস্তবে ঠিক তেমনটি ঘটে চলেছে। ইদানীং ওরা একটা অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছে। বোঝাতে চেষ্টা করছে অ্যাক্সিডেন্টের শিকার কে হবে। কিন্তু আমি বুঝে গেছি কে হবে ওদের পরবর্তী শিকার।

জে.বি স্টাম্পারের 'ভয়েসেস' অবলম্বনে।

নর-রাক্ষস

সাবধান!

আর্তচিৎকার বেরুল এডউইন স্টিফেন্সের গলা চিরে। ভয়ে, বিস্ময়ে আর আতংকে সবাই থরথর করে কেঁপে উঠল সামনের দৃশ্যটা দেখে। ওটা কী! সাগরের বুক চিরে পাহাড়ের মত বিশাল ঢেউটা প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে আছড়ে পড়ল ইয়টের ওপর। মুহূর্তে ভেঙে দুইখান করে দিল। চারজন যাত্রী শেষ মুহূর্তে তাদের তেরো ফুট লম্বা ডিঙিটা সাগরে নামিয়েছিল বলে রক্ষা। নইলে একজনকেও বাঁচতে হত না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওদের হতবুদ্ধি দৃষ্টির সামনে ইয়টটাকে গ্রাস করে নিল সাগরের কালো, খলবলে জলরাশি।

১৮৮৪ সালের ৩ জুলাই ক্যাপ্টেন টমাস গডলি তাঁর ইয়ট 'মিগনোনেট'কে নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন। সিডনির উদ্দেশে শুরুতেই ঝড়ের কবলে পড়ে যান। ষোলোদিন একের পর এক ঝড়ের মোকাবেলা করে চলেছিলেন তাঁরা। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না। উন্মত্ত সাগরের দানব ঢেউ তাঁদের সর্বনাশ করে গেল। ডুবিয়ে দিল সাধের ইয়ট। চার যাত্রী অসহায়ের মত বিশাল সাগরে ভাসতে লাগল ছোট্ট ডিঙিটাকে সম্বল করে।

প্রথম রাতেই আক্রমণ এল। ভয়ঙ্কর চেহারার একটা হাঙর যাত্রীদের ছোট ডিঙিটার পাশে ঘুরঘুর শুরু করল। শক্ত মাথা দিয়ে মাঝে মাঝে ঢুঁ দিতে লাগল ওটাতে। ডিঙি কেঁপে কেঁপে উঠল। সেইসাথে ভয়ে কাঁপল চার যাত্রী। খানিক পরে কী মনে করে হাঙর ডিঙিটাকে অনুসরণ করা ক্ষান্ত দিল। দূরে চলে গেল। আর ফিরল না।

কী ভয়ানক বিপদের মধ্যে আছে যাত্রীদের প্রত্যেকেই বুঝতে পারছিল। এই বিপদ থেকে কবে রক্ষা পাবে কিংবা আদৌ পাবে কিনা সে সম্পর্কে কারোরই ধারণা নেই। তাই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ওরা সতর্ক হলো। ঠিক হলো রেশনিং পদ্ধতিতে খাবার বণ্টন হবে। ক্যাপ্টেন নিজের জীবন বিপন্ন করে জাহাজডুবির পূর্ব মুহূর্তে শালগমের দুটো টিন নিয়ে আসতে পেরেছিলেন ডিঙিতে। সেই টিনের একটা খোলা হলো। সারাদিনে প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ হলো এক আউন্স করে শালগম। সামান্য এক আউন্স খাবারে তাদের পেটের আগুন না নিভলেও সীমাহীন তৃষ্ণার তীব্রতা থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পেল।

চতুর্থদিনে একটা বড়সড় কচ্ছপ চোখে পড়ল ওদের। ডিঙির পাশেই সাঁতরাচ্ছে। কৌশলে কচ্ছপটাকে ধরে ফেলল ওরা। চিৎ করে ফেলল পাটাতনের ওপর। খুশিতে চোখ ঝকমক করছে সবার। কচ্ছপ ধরার আনন্দে শালগমের দ্বিতীয় টিনটা খোলা হলো। উদ্দেশ্য একটু সেলিব্রেট করা।

কচ্ছপটাকে মেরে ওটার তাজা রক্ত পান করল যাত্রীরা, কিছু রক্ত রেখে দিল ক্যাপ্টেনের নিয়ে আসা ক্রনোমিটারের বাক্সের মধ্যে। পরে পান করবে। চাকচাক করে মাংসের ফালি কাটল ওরা। প্রচণ্ড খিদেয় কাঁচা মাংসই খেয়ে ফেলল। বাকিটা

পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে রাখল শুকাবার জন্য। পরে খাবে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, ঢেউ এসে ওদের ক্রমোমিটারের বাক্স দিল উল্টে, পাটাতনের ওপর ফালি করা টুকরোগুলোও ভাসিয়ে নিল।

বৃষ্টিপাতহীন আরও কয়েকটা অসহ্য দিন কেটে গেল। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ওদের চামড়া পুড়ে গেল, চোখ হয়ে উঠল রক্তাক্ত। প্রত্যেককেই ভয়ংকর লাগছে দেখতে।

সমুদ্রের জল পান করার তীব্র ইচ্ছে সবার মধ্যে বারবার চাগিয়ে উঠছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন সতর্ক করে দিলেন লোনাজল পান না করার জন্য। পরামর্শ দিলেন, তার চে' নিজেদের প্রশ্রাব খাওয়া অনেক ভাল।

আরও এক হপ্তা পেরিয়ে গেল। কিন্তু কোথাও কোনও পরিবর্তন নেই। সূর্য একঘেয়ে ভাবে পূর্ব দিকে ওঠে, সারাদিন ওদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে সন্ধ্যার সময় ডুব দেয় পশ্চিমে। ওরা অসহায়ের মত প্রকৃতির কাছে আকুতি জানায় একটু বৃষ্টির জন্য। কিন্তু প্রকৃতি ওদের আকুতি শোনে না।

চার যাত্রী কথা বলতেও যেন ভুলে গেছে। কেউ কথা বলতে চাইলে গলা থেকে কর্কশ, ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ বেরিয়ে আসে। তখনি চুপ করে যায়। তাই ওদের মধ্যে বলতে গেলে কথাই হয় না। সবাই সারাক্ষণ বিষণ্ন, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে কী যেন ভাবে।

ক্যাপ্টেন গডলি সাউদাম্পটন থেকে তাঁর ইয়ট নিয়ে সিডনি যাচ্ছিলেন দু'শো পাউন্ড ভাড়ায়। অর্ধেকটা যাত্রা শুরুর আগে তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। বাকিটা সিডনি পৌছার পর পাবার কথা। প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে আছে ক্যাপ্টেনের। ইংল্যান্ডে রেখে

আসা স্ত্রী আর বাচ্চাদের কথা খুব মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে আর কোনওদিন ওদের সঙ্গে দেখা হবে না।

একই চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে এডউইন স্টিফেন্সকেও। এই নাবিকের বাড়ি সাউদাম্পটনে। ওখানে তার স্ত্রী আর পাঁচ সন্তান থাকে. এডউইন জানে না আর কোনওদিন সে স্ত্রী, সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে কিনা।

এডওয়ার্ড ব্রুকসের পিছুটান নেই। ধর্মভীরু এই মানুষটা সারাক্ষণ শুধু দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে আর মনে মনে প্রার্থনা করে।

ওদের মধ্যে বয়সে সবচে' তরুণ ডিক পার্কারের অবস্থা এই মুহূর্তে ভীষণ কাহিল। ক্যাপ্টেনের নিষেধ সত্ত্বেও তৃষ্ণার জ্বালা সইতে না পেরে সে লোনা জল খেয়ে ফেলেছিল। এখন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

দুটো বৈঠা দিয়ে ওরা ডিঙি নৌকাটা বাইছে। কোথায় ভেসে চলেছে জানে না। উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে চলার চেয়ে পাল তুলে চলা অনেক সহজ। কিন্তু পাল কোথায় পাবে? তাই শার্ট খুলে একটা বৈঠার সঙ্গে বেঁধে কোনওমতে একটা পাল তৈরি করল। মনে সান্ত্বনা পেল যা হোক এখন আর আগের মত উদ্দেশ্যবিহীন চলতে হচ্ছে না।

দিন দিন যাত্রীদের কষ্ট বেড়েই চলেছে। অষ্টাদশ দিনে, একনাগাড়ে পাঁচদিন অনাহারে থাকার পর ওরা প্রায় ভেঙে পড়ল। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ওদের উন্মাদ করে তুলল। ঠিক এই সময় ক্যাপ্টেন গডলি ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভয়ংকর প্রস্তাবটা দিলেন।

বাঁচতে হলে খাদ্যের প্রয়োজন, বললেন তিনি, আর যেহেতু

খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না সেহেতু তাদের মধ্যে একজনকে বাকি তিনজনের জন্য মরতে হবে। বাকিরা তার মাংস খেয়ে বেঁচে থাকবে। এটুকু আত্মত্যাগ একজনকে করতেই হবে। নইলে সবাই মারা পড়বে।

এডওয়ার্ড ব্রুকস ভয়ানক আপত্তি করল। এরকম নৃশংস প্রস্তাবে তার সম্মতি নেই জানাল। তার চেয়ে ঈশ্বরের কাছে মুখ বুজে প্রার্থনা করা অনেক ভাল। ঈশ্বর একদিন না একদিন এতগুলো মানুষের প্রার্থনার জবাবে মুখ তুলে চাইবেনই।

ডিক পার্কার ডিঙির তলায় মড়ার মত পড়েছিল। অর্ধ সচেতন অবস্থাতেও ক্যাপ্টেনের ভয়ঙ্কর প্রস্তাবের কথা তার কানে গেল। ভয়ে কেঁপে উঠল সে। গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'মরব আমরা। আমরা সবাই মারা যাব।'

সবাই ওর দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। ডিক হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল।

এডউইন স্টিফেন্সের পেটে আগুন জ্বলছে। এখন ভাবাবেগের সময় নয়, ভাবল সে, সিদ্ধান্তটার একটা পরিসমাপ্তি টানা দরকার।

'আমরা যদি অপেক্ষা করি,' বলল সে, 'তা হলে কি আগামী দিনটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে?'

'ঠিক আছে, দেখি আরেকটা দিন অপেক্ষা করে,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু একজন মরলে যখন বাকি তিনজন বেঁচে যায় তখন এই অপেক্ষার কিন্তু কোনও মানে নেই।'

দুঃসহ একটি রাত কেটে গেল। সূর্য উঠল। কিন্তু নতুন আরেকটা দিন ওদের জন্য কোনও সৌভাগ্য বয়ে আনল না। ব্যাকুল চোখে ওরা দিগন্ত রেখার দিকে তাকিয়ে থাকল। যদি একটা পালতোলা জাহাজ কিংবা নৌকা দেখা যায়...। কিন্তু

দিগন্ত রেখা আগের মতই স্থির। সেখানে কোনও পালের ছবি ফুটল না। বিশাল সমুদ্রে ওরা খড়কুটোর মতই ভাসতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর ক্যাপ্টেন গডলি গলাখাঁকারি দিলেন। বললেন তিনি গতকাল যে প্রস্তাবটি দিয়েছেন সেটি আপাতঃদৃষ্টিতে নৃশংস মনে হলেও বেঁচে থাকার জন্য এর বিকল্প অন্য কিছু নেই।

ক্যাপ্টেন গর্ডলি যেন অন্যদের মনের কথাই নতুন করে তুলে ধরলেন। ওরাও বুঝতে পারছিল বেঁচে থাকতে হলে অন্য সবার জন্য একজনকে আত্মাহুতি দিতেই হবে। সত্যি এর বিকল্প নেই।

ক্যাপ্টেন স্পষ্ট গলায় বললেন, তিনি অনেক ভেবে ঠিক করেছেন তাদের জন্য ডিক পার্কারের আত্মত্যাগ করা সর্বোত্তম। কারণ বাকি তিনজনেরই পরিবার আছে শুধু ডিক ছাড়া। তা ছাড়া ডিকের এখন এমন অবস্থা, যে কোনও সময় সে মরে যেতে পারে, সুতরাং তাকে এভাবে কষ্ট না দিয়ে মেরে ফেলাই বরং ভাল হবে। তা ছাড়া মানুষ এর আগেও বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষের মাংস খেয়েছে বলে ক্যাপ্টেন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

ব্রুকস চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল। প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু কোনও কথা বলল না। কারণ জানে প্রতিবাদ করে ফায়দা হবে না। ক্যাপ্টেন এবং স্টিফেন্স ডিক পার্কারকে মেরে ফেলার পক্ষে। তার কোনও কথাই ওরা শুনবে না। তাই সে চুপ করে রইল।

ডিককে খুন করার নীল নক্সা যখন তৈরি করা হচ্ছে, ডিক তখন ডিঙির তলায় মাথার নীচে হাত রেখে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের কিছুই টের পেল না।

ক্যাপ্টেন গডলি এবং স্টিফেন্স এবার পরস্পরের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি বিনিময় করলেন যার একটাই মানে হতে পারে। ব্রুকস অসুস্থ বোধ করল। নিজেকে প্রচণ্ড অসহায় মনে হলো। একটা অসুস্থ মানুষ এভাবে খুন হতে চলেছে অথচ তার কিছুই করার নেই। এই পাপদৃশ্য দেখতে মন চাইল না ব্রুকসের। সে নৌকার মাথায় গিয়ে তারপুলিনে পা আর মাথা ঢেকে চুপচাপ শুয়ে রইল। প্রার্থনা করতে লাগল অলৌকিক কিছু ঘটার জন্য যাতে ডিক বেচারী রক্ষা পায়।

উচ্চস্বরে ক্যাপ্টেনও প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলেন এই বলে যে এ ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। তারপর ডিকের কাছে গেলেন তিনি। শুকনো গলায় বললেন, 'এবার, ডিক, তোমার সময় উপস্থিত।'

ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর চিনতে পেল ডিক। বিড় বিড় করে বলল, 'আমার? আমার কী, স্যার?'

'হ্যাঁ, ডিক, তোমাকে এখন মরতে হবে,' কর্কশ গলায় জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন গডলি। স্টিফেন্সকে বললেন ডিকের পা দুটো চেপে ধরতে যাতে নড়াচড়া করতে না পারে। তারপর কোমর থেকে ছুরিটা বের করলেন। একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন তিনি, পরক্ষণে ধারাল ব্লেড বসিয়ে দিলেন ডিকের গলায়।

ডিক প্রতিরোধ করতে পারল না। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও সে বুঝতে পারছিল না তাকে নিয়ে এরা কী করতে যাচ্ছে। বারকয়েক খিঁচুনি দিল সে। তারপর স্থির হয়ে গেল শরীর।

ডিকের রক্ত ওরা শ্যালগমের খালি টিন দুটোতে ধরে রাখল। এমনকী তারপুলিনের নীচে কাঁপতে থাকা ব্রুকস পর্যন্ত এগিয়ে এল যাতে তার ভাগে কম না পড়ে দেখতে, খিদের চোটে তার সমস্ত আদর্শ জলাঞ্জলি গেছে!

মৃত ডিকের উষ্ণ, তাজা, মিষ্টি রক্ত ওরা তিনজন আকণ্ঠ পান করল। সামান্য সুস্থির হয়ে ক্যাপ্টেন এবার লাশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দৃঢ় হাতে ডিকের হার্ট, লিভার ইত্যাদি কেটে ফেললেন। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে নিখুঁত ভাবে তিন ভাগ করা হলো। তারপর শুরু হলো ভোজন পর্ব।

রাক্ষসের মত ওরা ডিকের কাঁচা মাংস খেতে শুরু করল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়া লাল রক্ত তৃপ্তিভরে পান করল, চোখ বুজে আরাম করে মাংস চিবুতে লাগল। ওদের সমস্ত শরীর রক্তে মাখামাখি। ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাজা খুন। যেন একেকটা নর-রাক্ষস।

খাওয়া শেষ করে নগ্ন ডিকের ছিন্নভিন্ন শরীরটা একজন তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখল। তারপর সবাই ঘুমাতে গেল। অনেকদিন পর ভরপেট খেলেও কারও চোখেই ঘুম এল না। সবার মনেই চিন্তা এই রেশন ফুরিয়ে গেলে তখন কার পালা আসবে?

পর দিন আকাশে মেঘ করল। আনন্দে নেচে উঠল সবার মন। কিন্তু ওদের আনন্দ ম্লান করে দিয়ে কয়েকফোঁটা বৃষ্টি ঝরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মেঘখণ্ড। সবাই আবার বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

দুপুরের দিকে হঠাৎ কোত্থেকে একটা দমকা বাতাস এসে তারপুলিনের মধ্যে ঢুকে ওটাকে ফুলিয়ে তুলল। একমুহূর্তের জন্য সবার মনে হলো তারপুলিনের মধ্যে মৃত ডিক বুঝি উঠে বসেছে। আতঙ্কে সবাই থরথর করে কেঁপে উঠল। অনেকক্ষণ কেউ তারপুলিনটার দিকে ভয়ে তাকালই না। আরও অনেক পরে একজন ভয়ে ভয়ে তারপুলিনটা তুলল। না, ডিক পার্কার এখনও আগের মতই পড়ে আছে পাটাতনে। স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলল ওরা।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটতে লাগল অসহ্য ধীরগতিতে। মৃত ডিকের শরীর থেকে মাংস কেটে খাওয়া আর একদৃষ্টিতে দিগন্ত রেখার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনও কাজ নেই কারও। উদ্ধার পাওয়ার আশা নেই, কোনও ভরসা নেই।

এভাবে আটাশ দিন পর, ১০৫০ মাইল পথ পাড়ি দেয়ার পর, ভাগ্য সদয় হলো ওদের প্রতি। দুপুরে, ওরা ডিক পার্কারের শরীরের অবশিষ্ট অংশটুকু ভাগাভাগি করে খাচ্ছে, হঠাৎ স্টিফেন্স সঙ্গীদের পিলে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই দ্যাখো!'

মুখে মাংসের টুকরো, ব্রুকস মাথা তুলে তাকাল। দূরে, দিগন্তরেখার কাছে অস্পষ্টভাবে ফুটে আছে একটা জাহাজের কাঠামো। 'জাহাজ! জাহাজ!' চিৎকার করে উঠল ব্রুকস।

মৃত লাশটাকে ঢেকে ফেলল ওরা। প্রাণপণে বৈঠা বাইতে শুরু করল। কিন্তু জাহাজটা বড় দূরে। মনে হলো এ জনমে জাহাজে পৌঁছা যাবে না।

তারপরও ওরা কেউ থেমে থাকল না। বৈঠা বেয়ে চলল। সেই সঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগল।

আরও আধঘন্টা গেল। যাত্রীদের মনে হলো জাহাজের লোকেরা বোধ হয় ওদের দেখতে পেয়েছে। ওই তো হাত নাড়ছে! মুক্তির আনন্দে এবং প্রচণ্ড উৎসাহে ওরা বৈঠা বাইতে লাগল।

জাহাজটা জার্মানির। নাম 'মন্টেজুমা'। ক্যাপ্টেন সিমনসেন তিন হতভাগ্য যাত্রীকে তাঁর জাহাজে তুলে নিলেন। জাহাজে

উঠেই ক্যাপ্টেন গডলি বললেন, তারপুলিনের নীচে ডিক পার্কারের লাশ লুকিয়ে রাখা আছে, যাকে তিনি খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নিজ হাতে খুন করেছেন।

জার্মান জাহাজের এক নাবিককে দেখে ক্যাপ্টেন গডলি ভয়ানক চমকে উঠলেন। ডিক পার্কার জ্যান্ত হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরক্ষণে ভুল ভাঙল। এ ডিক নয়, তার মত দেখতে আরেকটা ছেলে। কিন্তু তারপুলিনের নীচ থেকে যখন লাশ বের করা হলো তখন ডিকের মত দেখতে ছেলেটি কান্নায় ভেঙে পড়ল। ডিক আর কেউ নয়, এই ছেলেটিরই যমজ ভাই!

ইংল্যান্ডে ফিরে এল ওরা। আদালতে বিচার হলো ওদের। সবকিছু অকপটে স্বীকার করল ওরা। শিউরে উঠল সবাই নরমাংস ভক্ষণের ঘটনা শুনে। বিচারে ক্যাপ্টেন গডলি আর স্টিফেন্সকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। কিন্তু রাণী এলিজাবেথের নির্দেশে পরবর্তীতে তা রহিত করা হলো। শুধু ছয়মাসের জেল খাটতে হলো ওদের। তারপর বেরিয়ে এল মুক্ত বাতাসে। কিন্তু ডিকের আত্মা যেন ওদের দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফিরল। তবে সে অন্য গল্প, অন্য কাহিনি।

মূল: জিওফ্রে উইলিয়ামসনের 'দে এট দেয়ার ইয়ং শিপমেট।'

ঝড়ের রাতে

সাঁঝের আঁধার ঘনাবার খানিক পরে শুরু হলো ঝড়। নিশাত সেই বিকেল থেকে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। বারবার কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে ক্রুদ্ধ বাতাস কখন রুদ্ধ আক্রোশে বাড়িটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই আশঙ্কায়। ওদের বাড়িটা শহরের শেষ প্রান্তে, তারপর বেশ বড় একটা মাঠ। ঘরের জানালা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় আকাশ ঢাকা কালো মেঘের ভেলাগুলো। গোটা আকাশ যেন ঝুলে আছে নিশাতের মাথার ওপর, তীব্র প্রতিহিংসায় ছুটে আসার অপেক্ষায়। নিশাত যেন জানত প্রকাণ্ড, বিকট চেহারার কালো মেঘগুলো একবার হামলা চালালে আর রক্ষা থাকবে না কারও।

রাতের বেলা সত্যি সত্যি হামলাটা হলো। ভীষণ আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে, দানবীয় উন্মত্ততায় বাতাস আছড়ে পড়ল নিশাতদের দোতলা বাড়িটার ওপর, ঝন ঝন শব্দে প্রবল ভাবে কেঁপে উঠল জানালার কাঁচ, সেই সাথে কাঁপিয়ে দিল নিশাতের আত্মা। সে ছুটে গিয়ে জানালার পর্দাগুলো টেনে দিতে লাগল। কাজটা শেষ করার পরে যখন ঘুরে দাঁড়াল, লক্ষ করল হাতজোড়া কাঁপছে থরথর করে। 'বোকা,' নিজেকে তিরস্কার করল নিশাত। 'এত ভয় পাবার কী আছে?'

নিশাতের নয় বছরের ছেলে জিবরান স্কুল থেকে ঠিক সময়েই ফিরেছে। আর ওর এক মাসের বাচ্চাটা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে দোতলায়, বেড রুমে। জিহান দেখতে হয়েছে অবিকল মায়ের মত। বড় হয়ে সে নিশাতের মতই সুন্দরী হবে, সন্দেহ নেই।

নিশাত বারান্দায় গিয়ে পেছনের ভারী দরজার হুড়কো টেনে দিল। নিচু হয়ে দরজার ফাঁকে কিছু ন্যাকড়া গুঁজে দিল যাতে বৃষ্টির পানি ঢুকতে না পারে। অবশ্য ইতিমধ্যে ফাঁক দিয়ে পানি গড়াতে শুরু করেছে।

সিধে হলো নিশাত। বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটছে যেন। মা হবার পরে পুরোপুরি শারীরিক শক্তি এখনও ফিরে পায়নি ও। ঘর-গেরস্থালির কাজ কয়েকদিন ধরে একাই করতে হচ্ছে। কাজের বুয়াটা ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবার পরে আর ফেরেনি।

'ওটা কীসের জন্য, মা?'

নিশাতের ঘাড়ের কাছে হাঁসের পালক দিয়ে কেউ যেন সুড়সুড়ি দিল। অন্ধকারে, বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে জিবরান কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পায়নি নিশাত। ভেজা মেঝের ওপর দু'পা ছড়ানো, নিশাতের দিকে ঝুঁকে এল জিবরান, আঙুল দিয়ে ছেঁড়া ত্যানাটা দেখাল, 'ওটা দিয়ে কী হবে?'

'পানি যাতে না ঢুকতে পারে সেজন্য এটা দিয়েছি,' ব্যাখ্যা করল নিশাত।

গলা দিয়ে বিদঘুটে আওয়াজ করে ঝট করে বসে পড়ল জিবরান, মোটা মোটা আঙুল দিয়ে ভেজা, চোপসানো কাপড়টা খামোকাই খোঁচাতে শুরু করল।

'অনেক হয়েছে, জিবরান,' কঠিন গলায় বলল নিশাত, এক

লাথিতে ন্যাকড়াটা আগের জায়গায় ঢুকিয়ে দিল।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল জিবরান, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মায়ের বাড়ানো হাতটা ধরল। তারপর দু'জনে মিলে ঢুকল কিচেনে। চুলো জ্বলছে। ঘরটা বেশ গরম। কিন্তু নিশাত উষ্ণতা অনুভব করতে পারছে না। কেমন ভয় ভয় লাগছে। জিবরানের বাবা একটা বিদেশী কোম্পানিতে চাকরি করে। তাকে দিন কয়েকের জন্য দেশের বাইরে যেতে হয়েছে। খুব শীঘ্রি ফিরে আসার সম্ভাবনাও নেই। এত বড় বাড়িতে ওরা তিনটি মাত্র প্রাণী। নয় বছরের একটা অপ্রকৃতিস্থ ছেলে, এক মাসের একটা অবোধ শিশু–দু'জনের নিরাপত্তার ভারই তার ওপরে। আর ওরা থাকে এমন একটা জায়গায় যেখানে আশপাশে কোনও ঘরবাড়ি নেই। আর এই ঝড়! বিকট শব্দে কাছে কোথাও বাজ পড়ল। আঁতকে উঠল নিশাত। ঝড়ের কবলে বন্দি ওরা। পালাবার পথ নেই!

হঠাৎ, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ ছাপিয়ে, শিশু কণ্ঠের গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল কোথাও থেকে। উঁউঁ করে কাঁদছে। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল নিশাতের। উন্মাদিনীর মত ছুটল দোতলার ঘরে। দ্রুত বেডরুমের আলো জ্বালল। নাহ্, জিহান দোলনার মাঝে পরম আয়েশে ঘুমাচ্ছে আগের মতই। ফুটন্ত গোলাপ একটা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার কিচেনে ফিরে এল নিশাত। জিবরান আপন মনে খেলা করছে, মা'র দিকে ফিরেও চাইল না।

গোঙানির আওয়াজ ছিল না ওটা আসলে, ভাবছে নিশাত। ভুল শুনেছে সে। ঝড়ের রাতে, মনে ভয় ঢুকে গেলে অমন অনেক আওয়াজই শুনতে পায় মানুষ।

আবার কেঁপে উঠল নিশাত। কান্নার শব্দটা শোনা যাচ্ছে

আবার! কান খাড়া করল সে। হ্যাঁ, সত্যি। গোঙাচ্ছে কেউ অবিরাম, ভাঙা গলা, আকুল আবেদন সে কণ্ঠে। রোমহর্ষক আওয়াজটা শুনে ঘাড়ের সমস্ত চুল খাড়া হয়ে গেল নিশাতের। অনেক কষ্টে আর্তচিৎকারটা চেপে রাখল দাঁতে দাঁত ঘষে।

উঠে দাঁড়িয়েছে জিবরান।

'পুসি ক্যাট, মা। ওকে কিছু বোলো না, মা। ভেতরে আসতে দাও।'

এবার ওটাকে দেখতে পেল নিশাত। সত্যি একটা বেড়াল। কাঁচ বসানো দরজায় নাক ঠেকিয়ে চেয়ে আছে এদিকেই। মিউমিউ করছে। তবে ওটাকে আর্ত, পীড়িত কোন প্রাণী মনে হলো না নিশাতের। মনে হলো শয়তান।

জিবরান ইতিমধ্যে তার মা'র হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে।

'ওকে ভেতরে আসতে দাও, মা। দেখছ না ও আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইছে।'

লোহার হুড়কো খুলল নিশাত, ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা মারল মুখে। দরজা সামান্য ফাঁক হয়েছে কি হয়নি, বেড়ালটা বিদ্যুৎগতিতে ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে।

প্রাণীটা রোগা, অসুস্থ, অপুষ্টিতে ভোগা চেহারা, হাড়গোড় গোনা যায়, চোখ জোড়া হলুদ। শত্রুতা মেশানো দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল নিশাতকে। ওটার গা ভিজে জবজবে, কাদা মেখে আছে। সাদা-কালোয় মেশানো রং।

জিবরান বেড়ালটাকে দেখে মহা উল্লসিত। হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে ওটার পাশে। 'পুসি ক্যাট। আহারে, বেচারা পুসি ক্যাট!'

ছেলেকে খুশি রাখার জন্য নিশাত একটা বাটিতে করে খানিকটা দুধ নিয়ে এল। ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে বেড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ল বাটির ওপর। চুক চুক করে দুধ খেতে লাগল। জিবরান উবু হয়ে বসে থাকল পাশে, বিস্ফারিত চোখে বেড়ালের দুধ খাওয়া দেখছে। মোটা, গোলগাল একটা হাত দিয়ে বেড়ালকে আদর করতে লাগল।

নিশাত টের পেল এরা দু'জনে একজোট হয়ে ইতিমধ্যে তার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠেছে। অন্তত তাদের আচরণ তাই প্রমাণ করে। বেড়ালটা ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে তার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে, জিবরানও তাই। যদিও নিশাত জানে না তার দোষটা কী। সে অবশ্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে নোংরা বেড়ালটাকে বাড়িতে আশ্রয় দেবে না।

'এতবড় ধাড়ি বেড়ালকে কিন্তু আমি রাখব না,' বলল সে দৃঢ় গলায়। 'ওর নিশ্চয় বাড়ি-ঘর আছে।'

জিবরান মা'র কথা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল, তারপর আহত প্রাণীর মত খেঁকিয়ে উঠল।

'কিন্তু বেড়ালটা আমার, মা। ও আমার কাছে এসেছে।'

'না, জিবরান। বেড়াল-টেড়াল রাখা যাবে না ঘরে। ছোট বাচ্চা আছে বাড়িতে। ওর অসুখ করতে পারে।'

বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জিবরান। ওটার পা জোড়া ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে, কিন্তু কোনও প্রতিবাদ করছে না। জিবরানের মরা মাছের মত চোখ দুটো ঝলসে উঠল রাগে। 'বাচ্চা! বাচ্চা! তুমি তোমার বাচ্চা নিয়ে থাকো, আমি আমার পুসি ক্যাটকে চাই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল নিশাত। 'ঠিক আছে,' শেষে বলল ও। 'কিন্তু ওকে বারান্দায় রাখবে। আমি চাই না ওটা

ঘরে ঢুকে সব কিছু নোংরা করে ফেলুক।'

স্টোর রুম থেকে পুরানো, ছেঁড়া একটা কাঁথা আর একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স খুঁজে আনল নিশাত। জিবরান বেড়ালটাকে কাঁথায় পেঁচিয়ে বাক্সে শুইয়ে রাখল। তারপর চলে গেল দোতলায়। সাথে সাথে কাঁচ লাগানো দরজাটা বন্ধ করে দিল নিশাত। এখন আর বেড়ালের ভেতরে ঢোকার উপায় থাকল না।

আলো-টালো নিভিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে নিশাত, হঠাৎ কী মনে হতে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল ও। হলুদ একজোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে, অনুসরণ করছে ওকে। কাঁচের ভেতর থেকে সটান চেয়ে আছে ওটা নিশাতের দিকে। নিশাতের মনে হলো চোখ জোড়া যেন ছুরির দুটো ফলা, ওর হৃৎপিণ্ডের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে ঝড়ের চিহ্নও রইল না। নিশাত জিবরানকে স্কুল বাসে উঠিয়ে দিয়ে এল। ঘরে এসে দেখে বেড়ালটা নেই। চলে গেছে। সারাদিন ওটার টিকিটিও দেখা গেল না। বিকেলে, জিবরান স্কুল থেকে ফেরার পরে, আবার দেখা মিলল বেড়ালের। অশুভ একটা সত্তা নিয়ে যেন হাজির হলো।

জিবরান হাঁচি দিচ্ছে। সর্দি লেগেছে। এখনই জ্বর এল বলে। ছেলেটার অ্যালার্জিক ফিভার আছে। ঠাণ্ডা লাগলে বা নাকে বেশি ধুলো ঢুকলেই হলো—ক্রমাগত হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো। তারপরেই জ্বর আসবে অবধারিত ভাবে।

রাতে কিছুই খেল না জিবরান, বরং নিজের ভাগের খাবারটা বেড়ালটাকে খাইয়ে দিল। মাঝে মাঝে ওটার সঙ্গে চোখাচোখি হলো নিশাতের। বিদ্বেষ মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেড়াল নিশাতের দিকে। নিশাত তার বাচ্চাকে দুধ

খাওয়াচ্ছিল। দ্রুত সরে এল ওখান থেকে। এই প্রথম সে বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। জিবরানকেও তাড়া দিয়ে বিছানায় পাঠাল। তারপর ফিরে এল রান্নাঘরে বাসন-কোসন ধুতে।

বেড়ালটা রান্নাঘরে বসে আছে। হলুদ চোখে এক দৃষ্টিতে দেখছে নিশাতকে। তীব্র ঘৃণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখ থেকে। মাগো, কী ভয়ানক চাউনি!

নিশাত বারান্দার দরজা মেলে ধরল, আদেশ করল বেড়ালকে চলে যেতে। বেড়াল ঘুরে দাঁড়াল, হলুদ চোখ জোড়া বারবার ঝিকিয়ে উঠল। পারলে চিবিয়ে খায় নিশাতকে। নিশাত এক পা এগোল সামনে, দাবড়ানি দিল। হিসিয়ে উঠল বেড়াল, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ, সাদা দাঁত, চোখ জ্বলছে ভীষণভাবে।

ইতস্তত করছে নিশাত। বেড়ালটাকে বারান্দায় অবশ্যই আটকে রাখতে হবে। কিন্তু ওটার ভাব-গতিক সুবিধের ঠেকছে না।

'এদিকে এসো, পুসি ক্যাট।' একটা হাত মেলে ওকে তোষামোদের সুরে ডাকল নিশাত। সাথে সাথে থাবা চালাল বেড়াল। হাতে কয়েকটা সরু সাদা রেখা ফুটে উঠল, দেখতে দেখতে রক্তে ভরে গেল। ভয়ে এবং যন্ত্রণায় চোখে পানি চলে এল নিশাতের। সে অন্ধ রাগে অক্ষত হাতটা দিয়ে ময়লা সাফ করার একটা ব্রাশ তুলে নিল, সজোরে ছুঁড়ে মারল শত্রুপক্ষের দিকে। মিস হলো টার্গেট। তবে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল বেড়াল। নিশাত রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বারান্দার দরজা বন্ধ করে ওপরে চলে এল।

ওই ঘটনার পর থেকে বেড়ালটা নিশাতকে দেখলেই দশ

হাত দূরে থাকে। জিবরানের স্কুলের সময়টাতে বেড়াল কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। তবে নিশাতের সন্দেহ, ওটা ঘরের আশপাশে ওঁৎ পেতে থাকে অথবা মাঠের ভেতরে লুকোয়। জিবরান স্কুল থেকে ফিরলে সে-ও হাজির হয়ে যায়। জিবরান ওর নিরাপত্তা, আশ্রয় এবং খাবারের যোগানদার। বেড়ালটাকে সে অসম্ভব ভালবাসে।

সর্দি বেড়ে যাবার কারণে জিবরানকে স্কুলে যেতে মানা করে দিল নিশাত। তবে ছেলের সাথে বেড়াল ছায়ার মত লেগে থাকল।

বেড়ালটাকে ইদানীং মোটাসোটা লাগছে, ফুলে উঠেছে পেট। বাচ্চা-টাচ্চা হবে নাকি? ভুরু কুঁচকে ভেবেছে নিশাত। পরক্ষণে নাকচ করে দিয়েছে চিন্তাটা। সম্ভবত জিবরানের খাবার খেয়ে ওর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে।

সেই রাতে নিশাত এসেছে জিবরানের শোবার ঘরে। দেখল বেড়ালটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে তার ছেলে। বেড়ালটাকে এক লাথিতে বিছানা থেকে ফেলে দেয়ার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে দমন করে সে ফিরে এল নিজের বেডরুমে। শুয়ে পড়ল।

তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে গেল নিশাত। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে জিবরান। চিৎকার করে ডাকছে তাকে।

হুড়মুড়িয়ে ছেলের ঘরে ঢুকে পড়ল মা। চোখ বন্ধ জিবরানের। দুঃস্বপ্ন দেখেছে। তাই চিৎকার করছে। ওকে আদর করল নিশাত, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আস্তে আস্তে শান্ত হলো জিবরান। নিশাত ওর গায়ে কম্বল টেনে দিয়ে ফিরে এল নিজের বিছানায়।

নিশাতের বেডরুম অন্ধকার। ভেতরে ঢুকতেই বোটকা একটা গন্ধ ধাক্কা দিল নাকে। আঁধারে ও দুটো কী জ্বলজ্বল

করছে? আঁতকে উঠে আলো জ্বালল নিশাত। সেই বেড়ালটা। পিঠ কুঁজো হয়ে আছে, পা জোড়া শক্ত, খুলির সাথে সেঁটে গেছে কান দুটো। বাচ্চার দোলনার নাইলনের রঙিন কাপড় ছিঁড়ে মাটিতে ঝুলছে। মখমলের লেপটাও ছেঁড়া, বেরিয়ে পড়েছে সাদা তুলা।

রাগে মাথায় আগুন ধরে গেল নিশাতের। উন্মাদিনীর মত একটা অস্ত্র খুঁজল এদিক-ওদিক তাকিয়ে। কাবার্ডের দরজার সাথে জিবরানের বাবার ঝোলানো ছাতাটা চোখে পড়ল শুধু। ওটা যখন হাতে নিয়েছে নিশাত ততক্ষণে বেড়াল সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে, আশ্রয় নিয়েছে রান্নাঘরের কোনায়। ওকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল নিশাত বারান্দায়। বারান্দার দরজা খুলে আবার তাড়া করল। তবে অক্ষত অবস্থায় জান বাঁচাতে পারল বেড়াল। এক লাফে বারান্দা থেকে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরদিন বেড়ালটা বাড়ির ধারেকাছেও এল না। ওকে সারাদিন বাড়ি থেকে খানিক দূরে, পরিত্যক্ত বাগানের লনে ঘোরাঘুরি করতে দেখল নিশাত।

বিকেলের দিকে একটা ঘটনা ঘটল। পাখির কিচ কিচ ডাক শুনে নিশাত তাকিয়ে দেখল ঝোপের আড়াল থেকে বেড়ালটা বেরিয়ে এসেছে, চোয়ালের ফাঁকে ছোট্ট একটা পাখি। রক্ত গড়াচ্ছে শরীর বেয়ে। মৃত্যু যন্ত্রণায় ডানা ঝাপটাচ্ছে অসহায় শিকার, বাতাসে সাদা পালক উড়ছে।

পাখির কাতর চিৎকারে ভয় পেয়ে গেল বাচ্চা, তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল।

'অনেক হয়েছে,' রাগে গলা বুজে এল নিশাতের। 'আর না।' সে এক ছুটে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, ধারাল, ভারী এক টুকরো পাথর তুলে নিল হাতে, তারপর সবেগে ছুঁড়ে মারল।

থ্যাচ করে বিশ্রী শব্দ হলো, অব্যর্থ লক্ষ্য। বেড়ালের মাথায় লেগেছে সাক্ষাৎ মিসাইল। ককিয়ে উঠে ওটা মুখ থেকে শিকার ফেলে দিল। তারপর প্রাণপণে ছুট দিল মাঠ লক্ষ্য করে।

মনে মনে সন্তুষ্ট বোধ করল নিশাত। যে রকম ব্যথা পেয়েছে তাতে বেড়ালটা আর এখানে ফিরে আসবে বলে মনে হয় না।

সত্যি সত্যি বেড়ালটাকে আর দেখা গেল না। প্রতিটি রাতে, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল জিবরান, বিলাপের সুরে ডাকল তার পুসি ক্যাটকে। বিকেলে লনে হেঁটে বেড়াল, খুঁজে ফিরল বেড়ালটাকে। কিন্তু বেড়ালটার আর দেখা মিলল না।

একদিন বিকেলে নিশাত বেরিয়েছে বাচ্চাকে প্যারামবুলেটরে নিয়ে। বাগানটা পরিত্যক্ত হলেও একেবারে জংলা নয়। নাম না জানা অনেক বুনো ফুল ফুটে আছে। আগাছা আর ঝোপঝাড়গুলোর বাড়তি অংশ ছেঁটে ফেলতে পারলে ওটাকে মোটামুটি মানুষ করা যাবে। আগে যারা এ বাড়িতে থাকত তারা বাগানটার খানিক যত্ন নিলে এমন দশা হত না। নিশাতের ইচ্ছে আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করে বাগানটার শ্রী যতটা সম্ভব ফিরিয়ে আনবে।

সে একটা ঝোপের আড়ালে প্যারামবুলেটর ঠেস দিয়ে রাখল। এখানে বাচ্চার গায়ে রোদ লাগবে না। সে হুডের ওপর ক্যাট-নেট বেঁধে দিল শক্ত করে, গুঁজে দিল ধাতব বকলসের মধ্যে। দোলনাটা পুরানো, জিবরানের জন্মের সময় কেনা হয়েছিল। তবে এখনও বেশ ভাল কাজ দিচ্ছে।

নিশাত ঘাস কাটার কাঁচিটা নিয়ে বাড়ির আরেক দিকে চলে গেল, ওদিকে আগাছার পরিমাণ বেশি।

ঝোপের ভেতর পোকার ঝিনঝিন শব্দ, সূর্যের উষ্ণ তাপ

পড়ছে নিশাতের খোলা হাতে। দ্রুত হাতে কাঁচি চালাচ্ছে সে, বেশ একটা ছন্দোবদ্ধ গতিতে নির্মূল হয়ে চলেছে আগাছা।

হঠাৎ এক ঝাঁক পাখি ঝোপের আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল, তাদের অপ্রত্যাশিত, সচকিত চিৎকার বিস্মিত করে তুলল নিশাতকে। পরক্ষণে শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে শুরু করল বরফ জল। অজানা ভয়ে বুকের ভেতর ঢিবঢিব শুরু হয়ে গেছে। কাঁচিটা ফেলে দিয়ে তাড়া খাওয়া প্রাণীর মত ছুটে গেল বাগানের কোণের দিকে, যেখানে ঝোপের আড়ালে প্যারামবুলেটর রেখে এসেছে সে।

ক্যাট-নেটটা মাটিতে গড়াচ্ছে, পাশে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে ছেঁড়া খোঁড়া একটা কাঁথা। কাঁপা হাতে কাঁথাটা তুলে নিল নিশাত।

চারটে বেড়াল-বাচ্চা, কারোই চোখ ফোটেনি এখনও, শুয়ে আছে মাটিতে, ঘুমাচ্ছে। ওদের পাশে নিশাতের আদরের জিহান চিৎ হয়ে পড়ে আছে, নিশ্চল, স্থির, একটা পুতুলের মত। রক্তাক্ত।

এমন সময়, দূরাগত শব্দ শুনে চোখ তুলে চাইল নিশাত। বাড়ি ফিরছে জিবরান, বুকে কিছু একটা জড়িয়ে ধরে আছে, আপনমনে বকবক করছিল। মাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল:

'মা, মা। আমার পুসি ক্যাট আবার ফিরে এসেছে। এখন কত মজা হবে, তাই না?'

ফ্রান্সিস স্টিফেন্সের 'পুসি ক্যাট, পুসি ক্যাট' অবলম্বনে।

বন্দিনী

হাসিবুল হাসান ছেলেবেলা থেকেই কঞ্জুস, বদমেজাজী, স্বার্থপর এবং ভয়ানক ঈর্ষাকাতর। এই লোকটি যখন একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ অফিস থেকে ফিরে এসে দেখল বেডরুমে, তারই বিছানায় তার সুন্দরী স্ত্রী শামীমা বিজনেস পার্টনার রায়হান গফুরের সাথে আদিম উন্মাদনায় ব্যস্ত, তখন স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফেটে পড়ে সে রক্তারক্তি একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

আশ্চর্য বলতে হবে, হাসিবুল হাসান কিছুই করল না। দোরগোড়ায় স্রেফ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, শুধু ফর্সা মুখ লাল থেকে বেগুনি হয়ে উঠল, চোখ বেরিয়ে আসতে চাইল কোটর ছেড়ে। হাসিবুলের পাতলা ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে আছে, দেখা গেল ঝকঝকে সাদা দাঁত, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল পরিষ্কার; দুই হাতই মুঠো করা, মোটা, খাটো কাঠামোটা থরথর করে কাঁপছে। রাগে ফুলছে সে, বিস্ফোরণ ঘটবে যে কোনও মুহূর্তে। শামীমা ঘোড়া বানিয়ে চড়ে বসেছিল রায়হান গফুরের ওপর, স্বামীর আকস্মিক আগমনে ভিড়িম করে একটা বোমা পড়ল মাথায়, সবটুকু রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। আর গফুর তাদের ব্যবসার পঞ্চান্ন ভাগের মালিক এবং বন্ধুটিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সভয়ে চোখ বুজল। হাসিবুল হাসানের মেজাজ তার ভালই জানা।

আছে। আগামী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে খুন হয়ে যাচ্ছে, এই ভাবনাটা তাকে অসহায় এবং অসাড় করে তুলল। কিন্তু ঝাড়া এক মিনিটের মধ্যেও কিছু ঘটল না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রায়হান। এক ধাক্কায় শামীমাকে গায়ের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে ট্রাউজার আর শার্টটা বগলদাবা করে গড়িয়ে নেমে এল বিছানা থেকে, ঝড়ের বেগে পাশ কাটাল হাসিবুল হাসানকে, এক লাফে উঠে পড়ল গাড়িতে। তারপর দে ছুট। শামীমা নড়ল না। নগ্ন শরীর নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রইল বিছানায়, বিমর্ষ এবং ভীত। তাকে চাউনি দিয়ে ভস্ম করার বৃথা চেষ্টা করে গোড়ালির ওপর ভর করে ঘুরে দাঁড়াল হাসিবুল হাসান, দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। অবশেষে বিছানা ছাড়ল শামীমা, কাপড় পরতে লাগল।

অবাকই লাগল শামীমার দুপুরের ঘটনাটা নিয়ে হাসিবুল ওকে কিছু বলল না দেখে। হপ্তা পেরিয়ে গেল, না ধমক না রাগারাগি। হাসিবুল ওর সাথে কোনও কথাই বলল না। এমনিতেও সে স্বল্পভাষী, অপ্রয়োজনে জিভ নাড়তেও কষ্ট হয়। কম কথার মানুষ বলে তাকে খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হত শামীমার। কিন্তু ব্যাপারটা এখন তার কাছে নরক যন্ত্রণা মনে হচ্ছে। একই ছাদের নীচে বাস করে, একই বিছানায় ঘুমিয়ে দুটি মানুষ কতদিন কথা না বলে থাকতে পারে? বিশেষ করে শামীমার মত উচ্ছল স্বভাবের মেয়ের জন্যে এটা নরক যন্ত্রণা বইকি। সে চাইছে হাসিবুল তাকে সেদিনের ঘটনার জন্যে বকাবকি করুক, গায়ে হাত তুললেও মানা নেই। শামীমা মানসিক যন্ত্রণার চেয়ে শারীরিক যন্ত্রণা পেতে বেশি ভালবাসে। তবে এ যন্ত্রণাটুকু চাই শুধু মিলনের সময়। তার শারীরিক চাহিদা প্রচণ্ড, কিন্তু হাসিবুল স্ত্রীর তীব্র খিদে মেটাতে অক্ষম। শামীমা সব সময় তার স্বামীর কাছ থেকে শরীরী আদর চায়। চায় বিছানায় হাসিবুল দানব হয়ে উঠুক। অথচ তার চাহিদা

কখনোই পূরণ হয় না। যার বুক ভরা কামনা, অঙ্গের প্রতিটি রোমকূপ দাউদাউ জ্বলে অতৃপ্তির আগুনে, সে কতদিন প্রায় নির্জীব একটা শরীর নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? এজন্যে বাধ্য হয়ে রায়হান গফুরের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল শামীমা। পুরুষ বটে গফুর! তার কথা ভাবলেই গরম হয়ে ওঠে কান। কিন্তু ওই ঘটনার পর আর কোনওদিন গফুরের চেহারা দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ আছে শামীমার। তবে গফুর আর না এলেও ক্ষতি নেই। শামীমার চেনা অনেক তরুণ-যুবা আছে, একবার ইশারা করলে কেনা গোলামের মত হুমড়ি খেয়ে পড়বে পায়ের কাছে। কিন্তু সমস্যা হলো হাসিবুলের পরিকল্পনাটি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চুপচাপ স্বভাবের লোকটা অফিস যাওয়া বাদ দিয়েছে। সারাদিন ঘরেই বসে থাকে, টেলিফোনে অফিসের লোকদের এটা-ওটা নির্দেশ দেয়। শামীমার সাথে তার শুধু সাক্ষাৎ হয় খাওয়া আর ঘুমের সময়। রান্না কেমন হয়েছে শামীমা ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলে 'হুঁ হাঁ' করে দায়সারা জবাব দেয় সে। শামীমার বাইরে যাওয়া এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। হাসিবুল তার সাথে কথা বলে না, এ ব্যাপারটা ধীরে ধীরে সয়ে এল, স্বামী প্রবর মাঝে মাঝে চুপচাপ কী ভাবে তা নিয়েও সে মাথা ঘামানো বাদ দিল। তবে শামীমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল দিনের পর দিন চার দেয়ালের মাঝে বন্দী থেকে। কাউকে ফোন করবে সে উপায়ও নেই। হাসিবুল বেডরুমে বসে কাজ করে, ফোনটা বিছানার কাছে। শামীমা তার খালার খবর নেবে, এরকম কিছু একটা অজুহাত তুলে রিসিভারের দিকে হাত বাড়িয়েছে একদিন, ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে শুধু তাকিয়েছে হাসিবুল, ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে গেছে ওর। আর কিছু বলার সাহস পায়নি। হাসিবুলের বেশিরভাগ ব্যবসা অস্ট্রিয়ার একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সাথে। হঠাৎ ওর অস্ট্রিয়া যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল, বার্ষিক বিজনেস কনফারেন্সে

যোগ দিতে হবে। তার অবর্তমানে শামীমা যাতে তার নাগরদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে না পারে, এজন্যে বুদ্ধি বের করল হাসিবুল। ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারত সে, কিন্তু তা হলে তার ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা হয়ে যাবে। প্রাইভেট সেক্রেটারিকে নিয়ে এবার দেশের বাইরে যাবে ঠিক করেছে হাসিবুল। মেয়েটি শামীমার চেয়ে হাজার গুণ সুন্দরী, তবে অমন খাইখাই ভাব নেই। একে বিছানায় সামাল দিতে বেগ পোহাতে হয় না হাসিবুলের। কাজেই শামীমার মত একটা যন্ত্রণাকে নিয়ে অমন মজা থেকে বঞ্চিত হবে কেন সে? শামীমা যেখানে আছে সেখানেই থাকুক।

তিন হপ্তার জন্যে হাসিবুল অস্ট্রিয়া যাচ্ছে শুনে শামীমা আনন্দে আটখানা হলো। যদিও চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিল না। বলল এ ক'টা দিন হাসিবুলের অভাব সে খুব অনুভব করবে। বাইরে বিষণ্ন চেহারা, ভেতরে উল্লাসের ফল্গুধারা নিয়ে শামীমা ভাবতে বসল এই তিন হপ্তায় সে কার কার সাথে মিলিত হবে। নিজের পরিকল্পনা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল শামীমা, খেয়ালই করল না হাসিবুল গত দু'দিন ধরে সেলারে বসে খুটখুট করে কী যেন করছে। যাবার আগের রাতে ঘটনাটা ঘটাল হাসিবুল। নিজেই হেসে এগিয়ে এল শামীমার কাছে, তারপর ও কিছু বুঝে উঠতে পারার আগে মুগুরের মত হাতটা চালাল সরাসরি কানের নীচে। সাথে সাথে জ্ঞান হারাল শামীমা, মেঝেতে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, চট করে ধরে ফেলল হাসিবুল, পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল অন্ধকার সেলারের দিকে।

অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল শামীমার। চারপাশে তাকিয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ছয়ফুট চওড়া, ছোটখাট একটা গুহার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে সে। সেলারের দেয়ালের একটা অংশ ভেঙে, ইট আর সিমেন্ট দিয়ে গুহাটা তৈরি করা হয়েছে। শামীমা দেখেই বুঝতে

পারল এটা হাসিবুলের কীর্তি। মেঝেতে কাঠের একটা পোস্ট, ক্রুশের মত দেখতে, তাতে লোহার চেইন দিয়ে বেঁধে রেখেছে শামীমাকে। হাসিবুলকে দেখল শামীমা। হাসছে। ভাঙা অংশে সিমেন্ট আর ইট লাগাচ্ছে। গুহার ওপাশে, সেলারের ছাদে ঝুলছে একটা নগ্ন বৈদ্যুতিক বাতি।

নিজের অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন শামীমা, তবে চেহারা দেখে মনে হলো না ভয় পেয়েছে। মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে, কানের নীচে অসম্ভব ব্যথা, ভোঁতা হয়ে গেছে অনুভূতিগুলো।

'কী করছ, হাসান?' প্রশ্ন করার সময় কেঁপে গেল গলা, হাত নাড়তেই ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল লোহার শিকল।

'এটাকে,' ইটের ওপর সিমেন্টের প্রলেপ দিতে দিতে বলল হাসিবুল, 'বলতে পারো সতীত্ব রক্ষার আধুনিক পদ্ধতি।'

শামীমা কিছু বলল না, পরিষ্কারভাবে কিছুই চিন্তা করতে পারছে না। অন্ধকারে, পায়ের ওপর দিয়ে একটা ইঁদুর চলে গেল, শিউরে উঠল সে।

হা হা করে হাসল হাসিবুল। 'সামান্য ইঁদুর দেখেই ভয় পেলে? তবে আমার বিশ্বাস তুমি শীঘ্রি এ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। বেশিদিন না—হপ্তা তিনেক থাকতে হবে তোমাকে এগুলোর সাথে।'

শামীমা এবারও চুপ করে রইল, বিষদৃষ্টিতে দেখছে স্বামীকে। হাসিবুলের হাড়-মজ্জা চেনে সে, জানে স্যাডিস্ট লোকটার পক্ষে সব করা সম্ভব।

হাসিবুল ভেতরে বিরক্ত বোধ করছে শামীমার নির্লিপ্ত ভাব দেখে। এটা আশা করেনি সে। চাইছে শামীমা চিৎকার করুক, ক্ষমা চাক, হারামজাদীকে সে দোজখের স্বাদ পাইয়ে দেবে। এখন কাঁদছে না, কিন্তু ক'টা দিন এই মৃত্যুগুহায় পড়ে থাকলেই হলো, কেঁদে কূল

পাবে না।

দেয়াল তোলা শেষ, বেলচাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল হাসিবুল। 'ভয় পেয়ো না—না খেয়ে মরবে না,' বিড়বিড় করল সে, হাত তুলল গুহার এক কোনায়। ওখানে বেশ কিছু কার্ড বোর্ডের বাক্স আর প্লাস্টিক কনটেইনার স্তূপ করা। 'প্রচুর খাবার আর পানি থাকছে, তবে আলোর মুখ দেখতে পাবে না। অমাবস্যার আঁধার ঘিরে থাকবে তোমাকে। অবশ্য রাতই তো তোমার প্রিয়, তাই না, শামীমা?' খিক খিক হাসল হাসিবুল হাসান, তারপর পা বাড়াল গুহার বাইরে।

শামীমা লক্ষ করল দেয়ালটা সেলার থেকে এই গুহা বা ঘরটাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নিরেট দেয়ালের মাঝখানে একটা ফোকর, বাতাস চলাচলের জন্যে। গর্তের ভেতর থেকে আলো আসছে। তারমানে সেলার ছেড়ে এখনও যায়নি হাসিবুল। খানিকপর আলোটা আর দেখা গেল না, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গ্রাস করল ওকে, শামীমা বুঝতে পারল চলে গেছে হাসিবুল। অবশ্য হাসিবুল মন খারাপ করে থাকল। কারণ শামীমাকে সে কাঁদাতে পারেনি।

সুন্দরী সেক্রেটারির সান্নিধ্যে অস্ট্রিয়া সফর চমৎকার হলো হাসিবুল হাসানের। তবে ফেরার পথে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করল। দোষটা হাসিবুলেরই। যাবার আগের দিন, সারারাত ডিস্কো ক্লাবে নেচেছে। স্ফূর্তির চোটে মনে ছিল না পরদিন সকালেই ফ্লাইট। কোম্পানি গাড়ি দিয়েছে ওকে অস্ট্রিয়ায় যে ক'দিন থাকবে, সে'কদিন ব্যবহারের জন্যে। সকাল বেলা সেই গাড়ি চড়ে ঘুম চোখে ঢুলতে ঢুলতে এয়ারপোর্ট রওনা হলো হাসিবুল। সেক্রেটারিকেও গত রাতে ঘুমাতে দেয়নি। সে হাসিবুলের কাঁধে মাথা রেখে মৃদু নাক ডাকছিল। গাড়ি চালাতে চালাতে কাল রাতের না কাটা মদের নেশায় বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল হাসিবুল, হঠাৎ তীব্র হর্নের আওয়াজে লাফিয়ে

উঠল। দেখল প্রকাণ্ড এক ট্রাক হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে ওর দিকে। দানবটাকে সাইড দিতে গিয়ে ব্রেক ফেল করল হাসিবুল, রাস্তা ছেড়ে গাড়ি ছুটল খাদের দিকে, পরক্ষণে ডিগবাজি খেতে খেতে পতন শুরু হলো ওটার। জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তে হাসিবুল শুনতে পেল তার সেক্রেটারি চিৎকার করছে। হাস্যকরই বলতে হবে, হাসিবুলের মনে হলো, ওই মেয়েটা কেন, আর্তনাদ করার কথা তো শামীমার। ঠিক তখন সারা শরীরে পেরেক ফুটল ওর, গাড়িটা আছড়ে পড়েছে পাথরের ওপর। নরম শরীর দুমড়ে-মুচড়ে গেল, যেন একটা দানব হাত ইচ্ছে মত গাড়িটাকে ধরে মোচড়াচ্ছে, ধাতু ছেঁড়ার বিশ্রী ফড়ফড় শব্দ হলো, তারপর হঠাৎ আশ্চর্য নীরব হয়ে গেল চারদিক।

হাসপাতালের ডাক্তার আর নার্সরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন ওদেরকে সুস্থ করে তুলতে। হাসিবুলের বুকের ভাঙা পাঁজরে অপারেশন করতে হলো, কাটা পড়ল দুটো আঙুল, সারা শরীরে অসংখ্য সেলাই দিতে হলো, শেষ পর্যন্ত কোমায় চলে গেল ও। তবে সেক্রেটারিকে চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না। ঘাড় ভেঙে গেছে তার।

টানা ন'টি মাস কোমার মধ্যে থাকল হাসিবুল, অবশেষে জ্ঞান ফিরে পেল। মনে পড়ে গেল শামীমার কথা। ভয় পেল। শামীমাকে হত্যা করতে চায়নি সে। কিন্তু শামীমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী মনে হলো নিজেকে। ধরেই নিয়েছে মরে গেছে শামীমা। ন'মাস না খেয়ে কোনও মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

হাসপাতালে হাসিবুলের দিন কাটতে লাগল অসহ্য যন্ত্রণায়। খুব কমই ঘুমায় ও। ঘুমোলেই স্বপ্ন দেখে শামীমাকে, লাশ হয়ে পড়ে আছে, ধুলো আর মাকড়সার জালে জড়ানো দেহটা খুবলানো, খেয়ে ফেলেছে ইঁদুর। আতঙ্কের চোটে জেগে যায় ও, আর ঘুম আসে না। হাসপাতালে শেষ দিনগুলো এত ঘনঘন দুঃস্বপ্নটা দেখল হাসিবুল,

মনে হলো পাগল হয়ে যাবে। ঘুম আসে না, ঘুম যাতে সত্যি না আসে সে চেষ্টায় চোখ মেলে থাকে। পুরো একটা বছর হাসপাতালে থাকতে হলো হাসিবুলকে, শেষে ডাক্তাররা রায় দিলেন এবার বাড়ি ফিরতে পারে সে। তবে পইপই করে বলে দিলেন প্রথম কটা মাস যেন খুব সাবধানে থাকে হাসিবুল। কোনও কারণে যেন রেগে না যায় বা উত্তেজিত হয়ে না ওঠে। ডাক্তারদের অবশ্য জানার কথা নয় কী প্রচণ্ড টেনশন আর উত্তেজনা নিয়ে হাসপাতাল ছাড়ছে তাদের রোগী।

বাড়ির অবস্থা যেমন ছিল তেমনই আছে। হাসপাতাল ছাড়ার আগে ঢাকায় ফোন করেছে হাসিবুল, অফিসের পিয়নকে নির্দেশ দিয়েছে ঘর-দোর পরিষ্কার করে রাখতে। জয়নুল কাজে গাফিলতি করেনি। ঝকঝক তকতক করছে সব।

এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি বাসায় চলে এসেছে হাসিবুল। কেউ তাকে রিসিভ করতে যায়নি। কাউকে বলেওনি যাবার জন্য। হাসিবুল সুটকেসটা হলওয়েতে রেখে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেলারে যাবার সাহস সঞ্চয় করছে।

হাসিবুল স্বস্তিবোধ করছে অফিসের কেউ তার কাছে শামীমার কথা জানতে চায়নি বলে। ঢাকায় কয়েকবার ফোন করেছে ও, কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেনি তার স্ত্রীর ব্যাপারে। এটার সম্ভাব্য কারণ একটাই–হাসিবুল ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক বলে তার বন্ধু নেই বললেই চলে। আর শামীমাকেও সে ঘরের বার হতে দিত না। শামীমার হঠাৎ নিরুদ্দেশ সম্পর্কে কারও মনে যদি প্রশ্ন জেগে থাকে সে হয়তো ধরে নেবে হাসিবুলের অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে শামীমা অস্ট্রিয়া গেছে। তবে সমস্যাটা হবে এখন। শামীমাকে তার সঙ্গে না দেখে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানতে চাইবে কোথায় সে। তখন একটা গল্প বানিয়ে বলা যাবে, ভাবল হাসিবুল।

সেলারে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না, তবে টের পাচ্ছে তীব্র একটা কৌতূহল ওদিকে বারবার টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ওকে। সেলারে ঢোকার ভারী কাঠের দরজাটার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল হাসিবুল, ইতস্তত করছে। হঠাৎ নীচে, কোথাও থেকে লোহার শিকলের মৃদু ঝনঝন শুনতে পেল ও। শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ জল নামতে শুরু করল। শামীমা বেঁচে আছে, এ ভাবনাটাই তো অবাস্তব। ওর জন্যে যে পরিমাণ খাবার আর পানি রেখে গিয়েছিল হাসিবুল তাতে শামীমার বড় জোর মাসখানেক টিকে থাকার কথা। হাসিবুল মনকে প্রবোধ দিল ভুল শুনেছে। কিন্তু তক্ষুণি আবার আওয়াজটা হলো।

ভেজানো দরজাটা কাঁপা হাতে খুলল হাসিবুল, বাতি জ্বালল, সিঁড়ি বেয়ে নামছে ধীর পায়ে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলার শব্দ আর সিঁড়ির ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ ছাড়া সেলার এখন সম্পূর্ণ নীরব। কপাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে হাসিবুলের, সেলারের মেঝেতে পা রাখল; ঠাণ্ডা, ড্যাম্প পড়া দেয়ালে কান পাতার আগে জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল শুকনো ঠোঁট জোড়া। কয়েক সেকেন্ড কিছুই শুনতে পেল না ও, তারপর, খুব আস্তে, ভেসে এল নারী কণ্ঠের মৃদু গোঙানি, একই সাথে লোহার চেইন ঘষার জোরাল আওয়াজ। তারপর আবার থেমে গেল সব, একটু পরে দেয়ালে খসখস শব্দ উঠল, নখ দিয়ে খামচাচ্ছে কে যেন। খামচির শব্দ হঠাৎই থেমে গেল, ভেসে এল অস্পষ্ট, কর্কশ একটা কণ্ঠ, গলাটা শুনে ভয়ে জমে গেল হাসিবুল।

'তুমি এসেছ, হাসান?' ফোঁস ফোঁস কান্না জড়ানো কণ্ঠটা জানতে চাইল দেয়ালের ওপাশ থেকে।

ইটের গাঁথুনির ওপর থেকে ঝট করে মাথাটা সরিয়ে নিল হাসিবুল, হাঁ হয়ে গেছে মুখ, অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল দেয়ালের দিকে। গলাটা সত্যি শুনতে পেয়েছে ও, কিন্তু ব্যাপারটা

অসম্ভব মনে হলো। শামীমা এখনও বেঁচে আছে!

'দাঁড়াও, শামীমা! আমি তোমাকে বের করে আনছি!' চেঁচিয়ে বলল হাসিবুল, ব্যস্ত চোখে এদিক-ওদিক চাইল দেয়াল ভাঙার কিছু পাওয়া যায় কিনা।

প্রায় এক বছর আগে ফেলে যাওয়া বেলচাটা পেয়ে গেল ও, ওটা নিয়ে কাজে নেমে পড়ল।

বেলচার আঘাতে শক্ত দেয়ালে সামান্য আঁচড় পড়ল মাত্র। ওটা ফেলে দিল হাসিবুল। অন্য কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে লাগল। চোখে পড়ল একটা স্লেজ হ্যামার, এক কোণে জং ধরা, বাগান করার কিছু সরঞ্জামের সাথে শুয়ে আছে চুপচাপ। ভারি, বিশাল হাতুড়িটা নিয়ে দেয়ালের দিকে পা বাড়াল হাসিবুল। প্রথম বাড়িতেই চিড় ধরে গেল। দ্রুত, ঘনঘন হাতুড়ির বাড়ি মেরেই চলল ও, ফাটলটা ক্রমে আকৃতি পেতে লাগল বড় গর্তে। অল্পতেই হাঁফিয়ে গেল হাসিবুল, হৃৎপিণ্ডের শব্দ হাতুড়ির মতই দমাদম বাজতে লাগল কানে। পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও, ফেলে দিল হাতুড়ি, খালি হাতেই দেয়াল থেকে ইট সরাতে শুরু করল। মানুষ ঢুকে যাবার মত গর্ত তৈরি হয়েছে বুঝতে পেরে ক্ষান্ত দিল, বসে পড়ল হাঁটু ভেঙে। বেদম হাঁপাচ্ছে, নখ উঠে রক্তাক্ত হয়ে গেছে আঙুল। অন্ধকার আর ধুলোর মধ্যেও অস্পষ্ট একটা আকৃতি দেখতে পেল হাসিবুল, গুহার এক কোণে কুঁজো হয়ে বসে আছে। ধুলো ফুসফুসে ঢুকে যেতে খকখক কাশল হাসিবুল, তার কাশির শব্দেই বোধহয় কুঁজো আকৃতিটা নড়ে উঠল। আস্তে আস্তে সিধে হলো, বেরিয়ে আসছে সেলারের হলুদ আলোয়, গত এক বছরে এই প্রথম তাকে পরিষ্কার দেখতে পেল হাসিবুল।

মূর্তিটাকে দেখে কাশি থেমে গেল, হাঁ হয়ে গেল মুখ, চিৎকার দেবে, বদলে অদ্ভুত ঘরঘর আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে।

শামীমা ওর কাছ থেকে হাত দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ওটা কি সত্যি শামীমা?

ওটার বাম চোখের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে সবুজ ফাঙ্গাস, উদ্ভিদটা খেয়ে ফেলেছে পুরো গাল, সাদা হাড় ধবধব করছে। মাথায় এক গাছি চুলও নেই, দগদগে ঘা ওখানটায়। প্রায় আকৃতিহীন মুখটার নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে, বেরিয়ে আছে বড়বড় হলুদ দাঁত। রক্ত গড়াচ্ছে চিবুক বেয়ে, চোয়ালের ফাঁকে ধরে আছে আধ-খাওয়া ইঁদুর। সাদা, দৃষ্টিহীন, কোটরে ঢোকা একটা চোখ নিয়ে কটমট তাকিয়ে থাকল মূর্তিটা, তারপর নড়ে উঠল, হাড্ডিসার কোঁচকানো মাংসের একটা হাত বাড়িয়ে দিল হাসিবুলের দিকে।

'জানতাম আমার কথা তুমি ভুলতে পারবে না, হাসান!' এগিয়ে আসতে শুরু করল সে।

'আমাকে চুমু খাও, হাসান, চুমু দাও!'

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল হাসিবুল, দৌড় দেবে, ঠিক তখন বুকে ছুরির মত খচ করে বিঁধল ব্যথাটা। টলতে টলতে দূর প্রান্তে চলে এল সে, হেলান দিল দেয়ালের গায়ে। জানে কাঠের পোস্টের সাথে বাঁধা আছে শামীমা, ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

এদিকে ব্যথাটা এত বেড়ে উঠল, নীল হয়ে গেল হাসিবুল। চোখ বুজে, দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সহ্য করার চেষ্টা চালাল। এমন সময় শিকলের ঝনঝনানি শুনে চাইল চোখ মেলে। ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে শামীমা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। যেভাবেই হোক শিকল খুলে ফেলেছে ও। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল হাসিবুলের চোখ, দেখছে ভয়াল মূর্তিটা টলতে টলতে কাছিয়ে আসছে ক্রমশ। দেয়ালের সাথে শরীরটা ঠেসে ধরল হাবিসুল, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে এক হাত বাড়াল। ঠিক তখন বুকের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটল, হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল ও। হৃৎস্পন্দন বজ্রপাত হয়ে কানে বাজতে

লাগল হাসিবুলের, একই সাথে শুনতে পেল মেঝেতে শিকল ঘষটানোর শব্দ। বার কয়েক মোচড় খেল হাসিবুল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

মুখোশ খুলে ঝটপট মেক-আপ তুলে ফেলল শামীমা। তারপর ফোন করল হাসপাতালে। অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে চলে এলেন ডাক্তার। হাসিবুলকে দেখেই বুঝলেন মারা গেছে সে। মুখ গম্ভীর করে বললেন এমন দুর্বল শরীর নিয়ে তার দেয়াল ভাঙতে যাওয়া মোটেই উচিত হয়নি। শামীমা তাঁকে বলেছে সে নাকি জানে না হঠাৎ সেলারের দেয়াল ভাঙার কী প্রয়োজন পড়েছিল হাসিবুলের।

আজিমপুরে দাফন করা হলো হাসিবুলকে। তার সাত কুলে কেউ নেই। অফিসের লোকজন শুধু এল জানাজায়। তাদের মধ্যে রায়হান গফুরও আছে। চোখাচোখি হতে অস্পষ্ট হাসির ঝিলিক দেখতে পেল সে শামীমার চোখে। প্ল্যানটা তা হলে কাজে লেগেছে, ভাবল গফুর।

অবশ্য পরিকল্পনাটি তার নয়, শামীমার। শামীমাকে যখন হাসিবুল সেলারে বন্দী করে রেখে গেল, মোটেই ভয় পায়নি সে। কারণ গফুর তাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল অ্যানুয়াল বিজনেস কনফারেন্সে অস্ট্রিয়া যাচ্ছে হাসিবুল। বলেছিল হাসিবুল যাবার পরপরই সে চলে আসবে শামীমার কাছে। সেলারে যখন গুহা তৈরির কাজে ব্যস্ত হাসিবুল ওই সময় ফোন করেছিল গফুর। তাই ফোনের কথা জানতে পারেনি সে।

হাসিবুল যাবার কিছুক্ষণ পর তার বাড়িতে হাজির হয়ে যায় রায়হান গফুর। ঘরে ঢুকতে অসুবিধে হয়নি কারণ শামীমা অনেক আগেই তাকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়েছে। গফুরের মোটরসাইকেলের সাড়া পেয়ে সেলার থেকে চিৎকার শুরু করে শামীমা, শিকল বাজাতে থাকে। তার গগনবিদারী চিৎকার শুনতে পায় গফুর, উদ্ধার করে প্রেয়সীকে।

অস্ট্রিয়ায় হাসিবুলের অ্যাক্সিডেন্টের কথা ওরা জানতে পেরেছে খবরের কাগজে। আর ঢাকা আসার আগে হাসিবুল ফোন করলে তার জন্যে ফাঁদ পাতা সহজ হয় শামীমার। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর সময় পেয়েছে ওরা। আবার সেলারে ফিরে যাবার প্ল্যানটা শামীমার। বিয়ের আগে ফিল্মে অভিনয় করত শামীমা, দ্বিতীয় সারির নায়িকা ছিল। মেক-আপটা ভালই বোঝে। প্রচুর সময় নিয়েছে সে ভয়ঙ্কর মূর্তির চেহারা ধারণ করতে। গফুর সেলারে নতুন করে দেয়াল তুলে দিয়েছে তার জন্য। তারপর, হাসিবুলের যেদিন ফেরার কথা, সেলারে ঢুকে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থেকেছে শামীমা। অপেক্ষা করেছে স্বামীর জন্যে। যা আশা করেছিল ঠিকঠাক সব ঘটে যাওয়ায় শামীমা খুব খুশি। হাসিবুলের মৃত্যুর পরে সে-ই এখন ব্যবসার পার্টনার। তবে হাসিবুলের মত অফিসে গিয়ে নীরস সময় কাটাবে না সে। তার নিজের কাজটুকু করে দেয়ার জন্যে গফুর লোক দেবে বলেছে; শামীমা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে সেই লোকটিকে দেখার জন্য। আশা করছে লোকটি সুদর্শন এবং আকর্ষণীয় হবে।

***